তাফছীরে রেজভীয়া

ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া

সুরায়ে ফাতেহা শরীফ

মাওলানা আকবর আলী রেজভী
ছুন্নী-আল্‌ক্বাদেরী
রেজভীয়া দরবার শরীফ, সতরশীর।

বড়পীর গাউসুল আজম শাহ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ৪১তম বার্ষিক ওরশ উপলক্ষে রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটির **উপহার**

প্রকাশনায়- রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটি
১৮৯ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন-৯৩৪২৪৮১

সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ- জিলকদ - ১৪২১ হিঃ
ফেব্রুয়ারি- ২০০১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ জোবায়ের সিদ্দিকী ইলিয়াস

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়-
আল ঈমান প্রিন্টিং প্রেস, মোক্তারপাড়া, নেত্রকোনা।

শুভেচ্ছা বিনিময় - ৩৫.০০ টাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অবতরনিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম।

আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামিনের শোকরিয়া এবং আল্লাহর হাবীব নূরে খোদা নূরে মুজাসসাম রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে লক্ষ লক্ষ দরূদ ও সালাম। সানন্দ চিত্তে জানাইতেছি যে, অত্যন্ত কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও তাফসীরে সুরায়ে ফাতেহা শরীফ পাঠকবৃন্দের হাতে তুলিয়া দিতে সামর্থ হইলাম।

সুরায়ে ফাতেহা শরীফ বস্তুতঃ কোরআনে কারীমের ভূমিকা। শুধু ভূমিকাই নহে, বরং সপ্ত আয়াতের সমাহার এই সুরায়ে ফাতেহা শরীফ সমগ্র কোরআন মজীদের জ্ঞান-ভান্ডার সমষ্টিগত ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মহীয়ানও গরীয়ান আল্লাহ পাক আহকামুল হাকেমিন জাল্লা জালালুহুর মহা হেকমত ও কৌশলের অনুপম অভিব্যক্তি হইতেছে এ সুরাহ ফাতেহা শরীফ। যাহার অপর এক নাম হইল উম্মুল কোরআন, কোরআনের মূল। মহা সমুদ্রকে ভরিয়া দেওয়া যতদূর বিস্ময়কর ব্যাপার তদপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ও অপূর্ব হইতেছে পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী গ্রন্থাদির সার শিক্ষা তথা সবশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ মহা বিজ্ঞানময় কোরআনে কারীম।

অতএব, প্রত্যেক জ্ঞানবান মুমিন-মুসলমানের অবশ্য করণীয় কর্তব্য হইল সুরায়ে ফাতেহা শরীফের মমার্থ ও সার শিক্ষা তথা যাবতীয় মাসায়েল অবগত হওয়া নতুবা দ্বীনি ইল্‌ম্ শিক্ষার পূর্ণ হক আদায় হইবে না। এই বিষয়টির যথার্থ গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ আমি সুরায়ে ফাতেহা শরীফের তাফসীর প্রণয়ন করিলাম।

এ গ্রন্থে, বিশেষভাবে আল্লাহ পাকের প্রশংসা স্তুতি এবং রবুবিয়াত বা সার্বিক লালন-পালন তথা স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। তদুপরি, ইনসানের ইনসানিয়াত, মুমিনের ঈমানী চেতনা ও বৈশিষ্ট্য এবং মুসলিম জনতার ইসলামী জিন্দেগীর সার্বিক কল্যাণকর দিক নির্দেশনা যথেষ্ঠ তথ্য সহকারে উপস্থাপিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

অনিবার্য ও সংগত কারণেই সিরাতুল মুস্তাকীম হইতে বিচ্যুৎ ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বাতিল ও ভ্রান্ত ফেরকার অপতৎপরতা ও অপকৌশল সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হইয়াছে। পথ ভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের কিছু আপত্তিকর প্রশ্নও অভিমতের সঠিক জওয়াবও দেওয়া হইয়াছে।

আমার জামাতা মাওঃ আব্দুল মোস্তফা মোঃ নূরুল ইসলাম রেজভী সুন্নি আল কাদেরী পাণ্ডুলীপি রচনায় সহায়তা করেন। আল্লাহ তার মঙ্গল করুন।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের অশেষ ফজল ও করমের দ্বারা তদীয় মাহবুব সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার তোফায়েলে এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং উভয় জাহানে জ্বাযায়ে খায়ের দানে সংশ্লিষ্ট সকলকে শামিল রাখিয়া ধন্য করুন-আমিন। ইয়া রাব্বুল আলামীন। বিজাহে হাবীবেকাল কারীম সাইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন।

মাওঃ আকবর আলী রেজভী
সুন্নি আল কাদেরী
নেত্রকোনা

রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটির কিছু কথা

" নাহমাদুহু ওয়া-নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম।"
অগনীত দরুদ ও সালাম রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামার উপর।

বড়পীর গাউসুল আজম হযরত শাহ সৈয়দ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্মরণে ৪১তম বার্ষিক ওরশ মোবারক উপলক্ষ্যে রেজভীয়া দরবার ঢাকা মহানগর কমিটির উদ্দ্যোগে সুরায়ে ফাতেহা শরীফের তাফসীর প্রকাশ করা হলো। হুজুর কেবলার লিখিত কোরআনে কারিমের তাফসীর অনন্য। বাংলা ভাষায় দ্বিতীয়টি আর নেই নিঃসন্দেহে। মনযোগ সহকারে পাঠ করলে তা অনুভব করা যাবে। বাকী তাফসীর সমূহ ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের আছে। আল্লাহ যেন আমাদের সে আশা পূরণ করেন। তাফসীর প্রকাশনায় কেউ সাহায্যের হাত বাড়ালে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করবো। তাফসীর প্রকাশনায় এগিয়ে আসবেন এ প্রত্যাশা করি। মুদ্রণ জনিত ত্রুটি দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তুবুও ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নহে। শ্রদ্ধেয় পাঠকগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরামর্শ দেবেন। পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করা হবে।

পরিশেষে, সকলের ঈমান আমান আল্লাহ হেফাজত করুন এ প্রার্থনা করছি।

তারিখ - ২-২-২০০১
ধলপুর
ঢাকা

রেজভী মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূঁইয়া
সম্পাদক
রেজভীয়া দরবার, ঢাকা মহানগর কমিটি
ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ

সুরায়ে ফাতেহা মক্কা শরীফে নাযিল হইয়াছে। ইহাতে ৭ (সাত)টি আয়াত রহিয়াছে। সুরায়ে ফাতেহা সম্পর্কে সর্ব প্রথম কতিপয় বিষয় জানা অতীব দরকারী। (১) সুরায়ে ফাতেহার নাম কতগুলি? (২) সুরায়ে ফাতেহার নাযিল হইবার কারণ। (৩) এই সুরার ফজিলত কি কি? (৪) ইহাতে কি কি মাছায়েল রহিয়াছে।

সুরায়ে ফাতেহার নামসমূহ

এই সুরার নামসমূহ সর্বমোট ২০ (বিশ)টি। যথাক্রমে, (১) ফাতেহা, (২) ফাতেহাতুল কিতাব, (৩) উম্মুল কোরআন, (৪) সুরাতুল কান্‌জ্‌, (৫) সুরাতুল ওয়াফিয়া, (৬) সুরায়ে কাফিয়া, (৭) সুরায়ে শাফিয়া, (৮) সুরায়ে শেফা, (৯) সুরায়ে ছাব্‌আমাছানী (১০) সুরায়ে নূর, (১১) সুরায়ে রুক্বিয়া, (১২) সুরাতুল হাম্‌দ্‌, (১৩) সুরায়ে দোওয়া, (১৪) সুরায়ে তালিমুল মাসআলা, (১৫) সুরায়ে মুনাজাত, (১৬) সুরায়ে তাফ্‌বিজ, (১৭) সুরায়ে সুওয়াল, (১৮) সুরাহ্‌ উম্মুল কিতাব, (১৯) সুরায়ে ফাতেহাতুল কোরআন এবং (২০) সুরায়ে সালাত। উক্ত সুরায় ৭ (সাত)টি আয়াত এবং ২৭ (সাতাইশ) টি কালেমা বা শব্দ এবং ১৪০ (একশত চল্লিশ)টি হরফ বা অক্ষর রহিয়াছে। এই সুরায় কোনও আয়াত নাছেখ বা মানছুখ নাই।

এই সুরার নামকরণের কারণ

'ফাতেহাতুল কিতাব' ঃ এই নামে আখ্যায়িত হইবার কারণ এই যে এই সুরার দ্বারা কোরআনে কারীম আরম্ভ করা হইয়াছে। এই জন্য হাদিস শরীফের কতক বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বপ্রথম এই সুরা নাযিল হইয়াছে।

সুরাতুল হাম্‌দ্‌-এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এই সুরার প্রথমে আলহাম্‌দু শব্দ রহিয়াছে।

উম্মুল কোরআন- এই জন্য বলা হইয়েছে যে, **'উম্মুল'** শব্দের অর্থ আসল বা মূল এবং এই সুরাহ্‌ সমস্ত কোরআনে পাকের আসল বা মূল। কোরআনে পাকের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে সুরায়ে ফাতেহায় আসিয়াছে। কোরআনে পাকের সঙ্গে এই সুরার ঐ ধরনের সম্পর্ক রহিয়াছে, যে ধরনের সম্পর্ক বীজের সঙ্গে বৃক্ষের রহিয়াছে। কেননা, বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষই রহিয়াছে। অর্থাৎ, বৃক্ষের ডালপালা,

পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদি গুপ্তভাবে বীজের মধ্যেই থাকে।

উম্মুল কিতাব- এই জন্যেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত আসমানী কিতাবসমূহের যাবতীয় বিষয়বস্তু এই ছুরায় আসিয়াছে। কেননা, আকায়েদ ও আমল ইত্যাদি সবই এই ছুরায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আল্লাহ পাকের 'জাত' ও 'ছিফাত' তথা আল্লাহ পাকের 'মাবুদিয়াত' সম্পূর্ণই এই সুরায় আসিয়াছে।

'ছাবআ মাছানী'-এই জন্যে বলা হইয়াছে যে, ইহার অর্থ 'সপ্ত আয়াত'; এবং এই সুরায় ৭টি আয়াত রহিয়াছে এবং দুইবার এই ছুরা নাযিল হইয়াছে। এই জন্যে এই নামে আখ্যায়িত হইয়াছে। নামাজের প্রতি রাকাতে এই সুরা পাঠ করা হয়। অর্ধ সুরায় আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা এবং বাকি অর্ধ সুরায় বান্দার প্রার্থনা। ইহাতে বুঝা যায় যেন এই সুরার অর্ধাংশ বান্দার জন্য এবং অর্ধাংশ আল্লাহ্ পাকের জন্য। এই জন্য ইহাকে **ছাবআ মাছানী** বলা হইয়াছে। এই সুরার ন্যায় অন্য কোন সুরা অন্য কোন আসমানী গ্রন্থেই নাযিল হয় নাই।

সুরায়ে ফাতেহার ছাওয়াব সমগ্র কোরআনের সপ্তম অংশের সমান। যে ব্যক্তি এই সুরা ৭ বার পাঠ করিবে সে পূর্ণ কোরআন পাঠের সাওয়াব পাইবে। এই সুরায় ৭ (সাত) খানা আয়াতও রহিয়াছে, আবার দোজখের দরজাও ৭টি। যে ব্যক্তি এই সপ্ত আয়াত বিশিষ্ট ছুরা পাঠ করিবে ইন্‌শাআল্লাহ তাহার জন্য দোজখের ৭টি দরজাই বন্ধ হইয়া যাইবে। হাদিস শরীফে আসিয়াছে যে, একবার জিবরাঈল আমীন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের দরবারে হাজির হইয়া বলিলেন, 'আমি আপনার উম্মতের জন্যে দোজখের আজাবের ভয় করিতাম কিন্তু যখন সুরায়ে ফাতেহা নাযিল হইল তখন আমি সান্ত্বনা পাইয়াছি। কেননা, এই সুরায় সাতখানা আয়াত দোজখের সাতটি দরজার চাবি স্বরূপ (তাফছীরে কবীর)।

সুরায়ে ওয়াফিয়ার- অর্থ পূর্ণ হওয়া। এই ছুরার বৈশিষ্ট্য এই যে, নামাজের প্রতি রাকাতে পূর্ণ সুরা পাঠ করিতে হয়। অন্য সুরা ২ রাকাতে অর্দ্ধাংশ কিংবা তদপেক্ষা কম-বেশ করিয়া পাঠ করা জায়েজ আছে।

সুরায়ে কাফিয়া- এই জন্যে বলা হইয়েছে যে, এই সুরা অন্য সুরার পরিবর্তে যথেষ্ট। কিন্তু এই সুরায়ে ফাতেহার পরিবর্তে অন্য কোন ছুরা নাই।

সুরায়ে শাফিয়া- এই জন্য বলা হয় যে, জহর বা বিষ এবং শত শত প্রকার রোগের শেফা-বা প্রতিষেধক এই ছুরা ফাতেহা শরীফ। জনৈক ছাহাবী একসময় এক ব্যক্তিকে মৃগী রোগে আক্রান্ত হইয়াছে দেখিতে পাইয়া সুরায়ে ফাতেহা শরীফ পাঠ করতঃ ঐ ব্যক্তির কানে ফুঁক দিলেন; তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তি আরোগ্য হইয়া গেল। তিনি এই ঘটনা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের নিকট বর্ণনা করিলেন। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ইরশাদ ফরমান এই সুরা সর্ব প্রকার রোগের ঔষধ। ইন্‌শা-আল্লাহ তায়ালা এই বিষয়টি ফাওয়ায়েদের বর্ণনায়

বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সুরায়ে ছালাত - এই জন্যে বলা হয় যে, এই সুরায়ে ফাতেহা প্রত্যেক নামাজে প্রত্যেক রাকাতে পাঠ করা একান্ত অপরিহার্য।

সুরায়ে সওয়াল- এই জন্যে বলা হইয়াছে যে, বান্দাগণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিবার নিয়ম পদ্ধতি এই সুরায় বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই যখনই দোয়া করিবে তখন প্রথমেই আপন প্রভুর প্রশংসা করিবে এবং বিনয়-নম্রতা ও একাগ্রতার সহিত বন্দেগী করিবে তারপর নিজের প্রয়োজনীয় নেক বাসনা সমূহ আপন প্রতিপালকের নিকট পেশ করিবে এবং দুনিয়ার বিষয়াদির চাইতে পরকালের বিষয়াদি বেশী প্রার্থনা করিবে।

সুরায়ে শোকর এবং **সুরায়ে দোয়া**- এই ছুরাকে এই জন্যেই বলা হইয়াছে যে, ইহাতে বান্দাগণকে আল্লাহর শোকরিয়া করিবার এবং দোয়া করিবার নিয়ম-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

সুরায়ে ফাতেহার শানে নুযুল

এই ছুরা নাযিল হওয়ার ব্যাপারে তিনটি বর্ণনা রহিয়াছে।

১নং বর্ণনা- এই যে, মক্কা মুকার্রামায় হিজরতের পূর্বে নাযিল হইয়াছে। বরং কতক আলেমগণ বলেন যে, সর্ব প্রথম সুরায়ে ফাতেহা নাযিল হইয়াছে। যেহেতু, ইহার ঘটনা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার নিকট তাশরিফ নিয়াছিলেন এবং বলিলেন যখন আমি একা একা নীরবে বসিয়া থাকি তখন গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাই যে, কে বলিতেছেন পাঠ করুন। এই সংবাদ ওয়ারাকা ইবনে নওয়াফেলকে জানান হইলে তিনি বলিলেন এখন হইতে এই আওয়াজ যখনই আসে তখনই আপনি নীরব অবস্থায় শ্রবণ করিবেন। যাহা হউক, এই অবস্থা পুনরায় হইল। জিবরাঈল আলাইহিচ্ছালাম হুজুর পোরনূর আলাই হিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং জিবরাঈল আমিন আরজ করিলেন 'পাঠ করুন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

এই রেওয়ায়েত বা বর্ণনা অনুযায়ী প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সর্ব প্রথম সুরায়ে ফাতেহা শরীফ নাযিল হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, সর্ব প্রথম সুরায়ে ইক্বরা নাযিল হইয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ণনা- এই যে, এই ছুরা হিজরতের পরে মদীনা শরীফে নাযিল হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নামাজ মক্কা শরীফে শবে মেরাজে ফরজ হইয়াছিল এবং নামাজে ফাতেহা পাঠ করা অতীব দরকারী। যদি এই

সুরায়ে ফাতেহা মাদানী হইয়া থাকে তবে এতদিন মুসলমানগণ মক্কী জিন্দেগীতে ফাতেহা ব্যতীতই কি নামাজ পড়িয়াছে? তাহলে নামাজে প্রথম কি পড়িয়াছে?

তৃতীয় কথা এই যে, এই ছুরা প্রথম বার হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে এবং হিজরতের পর মদীনা শরীফে দ্বিতীয় বার নাযিল হইয়াছে। এই জন্যে, এই ছুরাকে **"ছাব্‌আ মাছানী"** বলা হয়। কেননা, এই ছুরায় ৭ (সাত) আয়াত এবং ২ (দুই) বার নাযিল হওয়ার মধ্যে হেকমত (রহস্য) রহিয়াছে। যাহাতে এই ছুরার শান বা মহিমা বুঝিতে পারে এবং হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের সুমহান শান-মান (মর্যাদা) বুঝিতে সক্ষম হয়। এই হেতু যে, কোরআনে পাকের আয়াতে কারিমা প্রকৃতপক্ষে হুজুর ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালামের জন্য উচ্চ নিয়ামত।

নোট ঃ ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কোরআনে কারিম নাযিল হওয়ার কারণ কেবল হজরত রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এলেম বৃদ্ধি হওয়ার জন্যেই নহে, বরং ইহাতে বহু বহু ধরনের হেকমত বা রহস্যও নিহিত রহিয়াছে। ছুরা, আয়াত, মক্কীও মাদানী প্রভৃতির মধ্যেও বহু হেকমত রহিয়াছে।

আয়াত ঐ বাক্যকে বলা হয় যাহাতে কথা ও ভাব পূর্ণতা লাভ করে। ইহার কোন পৃথক নামকরণ হয় নাই। যেমন- আমরা কথা বলিতে বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকি। কোরআনে পাকের আয়াতে কারিমা এই জন্য বলা হয় যে, আয়াত অর্থ নিশানা বা নিদর্শন। আর যেহেতু কোরআনে কারিমের প্রত্যেকটি আয়াত গভীর তাৎপর্য ও হেকমত সহকারে কোরআনে কারিমের সত্যতার প্রমাণ ও কোরআন নাযিলকারী আহকামুল হাকেমিনের অস্তিত্বের ও সুমহান শানের প্রমাণ এবং ছাহেবে কোরআন মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের সত্যতার প্রমাণ ও সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সবচেয়ে ছোট আয়াত- مُدْهَامَّتٰن (মুদ্দাহাম্মাতানে) এবং সবচেয়ে বড় আয়াত মাদানীয়া যাহা সুরায়ে বাকারার শেষ রুকুতে রহিয়াছে। ইহাকে আয়াতুল কুরছি বলা হয়।

سورة ছুরাত শব্দটি سور ছুর হইতে বাহির হইয়াছে যাহার অর্থ হইতেছে বেষ্টনী। শহরের চারি পার্শ্বের পরিবেষ্টনকারী দেওয়ালকে 'চুরুল বালাদ' বা শহর বেষ্টনকারী-কিংবা শহরের নিরাপত্তাদানকারী বলা হইয়া থাকে, কোরআনে পাকের মর্মে সুরাহ কোরআনে পাকের আয়াত বা পরিপূর্ণ বিষয়বস্ত ও মর্মবাণীর ধারক ও প্রকাশক বটে। এই জন্যে সুরাহ সমূহের বিভিন্ন নাম রহিয়াছে। যেমন-সুরায়ে ফালাক, সুরায়ে নাছ, সুরায়ে ইখলাছ, কাওছার, বালাদ ও বাকারা প্রভৃতি। সুরাহ্ ও আয়াত দুই প্রকার - মাক্কী ও মাদানী। মাক্কী উহাকেই বলা হয় যাহা হিজরতের পূর্বে নাযিল হইয়াছিল; এবং যে কোন স্থানেই হউক সে

আয়াত বা সুরাহকে মক্কী বলা হয়। মাদানী উহাকে বলা হয় যাহা হিজরতের পরে নাযিল হইয়াছিল যে কোন স্থানেই হউক। যেহেতু, হিজরতের পর যখন হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম মক্কা মুয়াজ্জমায় আগমণ করিলেন এবং তথায় ওহি যাহা নাযিল হইয়াছিল তাহাও মক্কী নহে বরং মাদানী আয়াতরূপেই স্বীকৃত। কেননা, তাহা হিজরতের পর নাযিল হইয়াছে। কতক লোকের ধারনা যে, যাহা মক্কায় নাযিল হইয়াছে তাহা মক্কী আর যাহা মদীনা মুনাব্বারায় নাযিল হইয়াছে তাহা মাদানী বলা হইবে। কিন্তু এই ধারনা শুদ্ধ নহে। যদি মক্কী ও মাদানী হইবার অর্থ এই হইত তবে কতক আয়াত শরীফ 'তায়েফের' মধ্যেও নাযিল হইয়াছে; তাহলে, ঐ আয়াতসমূহ তায়েফী হইয়া যাইত। তবে সুরায়ের ফাতেহা শানে নুযুল প্রসংগে মক্কী ও মাদানী উভয়ই শুদ্ধ। কোরআনে কারীমের সবচেয়ে ছোট সুরাহ হইল সুরায়ে কাওছার এবং সবচেয়ে বড় সুরাহ্ হইল সুরায়ে বাক্বারাহ।

গুরুত্ব পূর্ণ কথা

জানিয়া রাখিবেন, অতীতে আমাদের নবী হুজুর পোরনুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ত্বালেব ছিলেন এবং আল্লাহর কালাম 'মাত্বলুব'। এই জন্য এই কিতাব গ্রহণের জন্য হুজুর খাছ জায়গায় হেরাগিরি গুহায় যাইতেন। হজরত মুসা আলাইহিচ্ছালাম 'তাওরিত' কিতাব গ্রহণের জন্য 'তুর' পাহাড়ে যাইতেন। কিন্তু আমাদের নবী সারোয়ারে কায়েনাত হুজুর পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রকৃত পক্ষে 'মাত্বলুব,' আর কিতাবুল্লাহ আল কোরআন ত্বালেব। অর্থাৎ, ত্বালেব মাত্বলুবকে তালাস করে। মাত্বলুব যেখানে যায় ত্বালেবও সেখানে যায়। কাজেই, হুজুরে পাক যেথায় কোরআনে পাকও সেথায়, যখন হুজুরে পাক মক্কী, আয়াতে কোরআনও মক্কী; আর হুজুরে পাক যখন মাদানী আয়াতে কোরআনও তখন মাদানী হইয়াছে। হুজুরে আনোয়ার ছাহেবে কোরআন আগে আগে আর আয়াতে কোরআন পিছে পিছে অনুসন্ধান ও অনুসরণকারী। সাধারণ লোকের ধারনা যে, হুজুরে পাক কোরআনের অধীনে। কিন্তু না, হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াত্ তাছলিম বহু বহু জ্ঞান ও গুণের দ্বারা কোরআনের অধীন নহে, বরং কোরআনই হুজুরে পাকের অধীন। হুজুরে পাক আরাবী, কোরআনে পাক ও আরাবী, হুজুরে পাক মক্কী ও মাদানী কোরআনে পাকের আয়াতও মক্কী ও মাদানী হইয়াছে। বহু বহু আয়াত হুজুরে পাকের মর্জি ও সন্তুষ্টি মোতাবেক নাযিল হইয়াছে যেমন- কেবলা পরিবর্তন ইত্যাদি।

সুরাহ্ সমূহের নামকরণ প্রসংগ

কোরআনে কারিমের সুরা সমূহের নামকরণ ইহার কতক আয়াত বা বাক্য কিংবা শব্দ অথবা কোন উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছে। যেমন- সুরায়ে ফাতেহাকে 'আলহামদু' বলা হইয়া থাকে। এই জন্যে যে, ইহাতে শুরুতেই 'আল্হাম্দু' শব্দ আসিয়াছে। সুরায়ে বাকারা'র নাম বাকারা এই জন্যে রাখা হইয়াছে যে, ইহাতে 'গরুর' আলোচনা আসিয়াছে। 'ক্বোল্হুয়াল্লাহু' -ছুরার নাম সুরায়ে 'এখলাছ' এই জন্যে রাখা হইয়াছে যে, ইহার উদ্দেশ্য ধর্মকে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অর্থাৎ আল্লাহ'র সন্তুষ্টির জন্যেই বানান হয়। ছুরার নামের মধ্যে এই উদ্দেশ্য নহে যে, ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত শুধু ধর্মের বিষয়বস্তুই আলোচিত হইবে। সুরায়ে বাকারার মধ্যে শত শত বিষয় রহিয়াছে। অথচ ইহার নাম সুরায়ে বাকারা রাখা হইয়াছে একটি বিশেষ কারণে। ইহার মিছাল ডাক্তারী ঔষধের। বিভিন্ন প্রকার ঔষধের নাম বিভিন্ন প্রকার রাখা হইয়া থাকে বিশেষ বিশেষ কারণ ও লক্ষণ অনুযায়ী।

সুরায়ে ফাতেহায় ৭ (সাত) খানা আয়াত। ইহাই সর্বসম্মত অভিমত। কাজেই, সুরাহ ফাতেহার নাম ছাবআ মাছানী। কিন্তু তথাপি, কিছু মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, ৭ আয়াত কোনটি? ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহ আলাইহে)-এর মতে 'বিসমিল্লাহ' প্রথম আয়াত এবং صِرَاطَ الَّذِيْنَ ছিরাত্বাল্লাজিনা হইতে وَلَا الضَّالِّيْنَ ওয়ালাদ দোয়াল্লীন পর্যন্ত এক আয়াত। অর্থাৎ- عَلَيْهِمْ আলাইহিম-এর উপর ওয়াকফে নাই। বরং ইমাম শাফেয়ী (রহমতুল্লাহি আলাইহে)-এর নিকট بِسْمِ اللّٰهِ বিছমিল্লাহ্ প্রত্যেক সুরার প্রথম আয়াত এই জন্যে ইমাম শাফেয়ীর মজহাবের অনুসারীগণ **বিছমিল্লাহ** উচ্চ আওয়াজে পড়িয়া থাকেন, এবং ইমামে আজম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহ আলাইহে)-এর নিকট **বিছমিল্লাহ্** কোন সুরার অংশ নহে। প্রথম আয়াত الحمد لله **আলহামদুলিল্লাহ্** এবং عليهم **আলাইহিমের** উপর ওয়াক্ফে রহিয়াছে।

সুরায়ে ফাতেহার মর্যাদা ও উপকারিতা

এই সুরার মর্যাদা অসংখ্য। কিছু সংখ্যক মাত্র তাফছীরে কবীর ও আশরাফুত্ তাফছীর হইতে নকল করা হইল। মুসলিম শরীফে আছে যে, একবার এক ফেরেশতা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিল যে, ইয়া রাছুলাল্লাহ! ধন্যবাদ আপনার প্রতি যে, আপনি এমন দুইটি নূর পাইয়াছেন যাহা অন্য কোন নবী রাসুল পান নাই। **১নং সুরায়ে ফাতেহা** এবং **২নং সুরায়ে বাকারার শেষ আয়াতসমূহ।**

তিরমিজি শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন সুরায়ে ফাতেহার মত কোন ছুরা তৌরাত, ইঞ্জিল এবং জবুর কিতাবে নাই। তাফছীরে কবীরে আছে যে, আল্লাহ পাক ১০৪ (এক শত চার) খানা আসমানী কিতাব ও ছহিফা নাযিল করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১০০ (একশত) কিতাবের এলেম ৪ (চার) কিতাবে রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ, তৌরাত, ইঞ্জিল ও জবুর কিতাবে উক্ত কিতাব সমূহের সারমর্ম রহিয়াছে। আবার, এই সমস্ত আসমানী কিতাব সমূহের (সারমর্ম) এলেম কোরআনে পাকে রাখা হইয়াছে। আবার, কোরআনেপাকের এলেম (সারমর্ম) সুরায়ে হুজুরাত হইতে সুরায়ে নাছে'র মধ্যে রাখা হইয়াছে। এইহেতু, যে ব্যক্তি সুরায়ে ফাতেহা শিক্ষা করিল সে যেন সমস্ত আসমানী কিতাব শিক্ষা করিল, অর্থাৎ, সে সমস্ত আসমানী কিতাবের আলেম হইল। আর যে ব্যক্তি সুরায়ে ফাতেহা পাঠ করিল সে যেন সমস্ত আসমানী কিতাব পাঠ করিল, এই সুরায়ে ফাতেহা শরীফ রহমতের ছুরাহ। এই জন্যে ইহাতে আল্লাহর গজব ও জবর এবং জাহান্নামের আজাবের কথা উল্লেখ হয় নাই। বরং এই সুরায় ঐ সমস্ত অক্ষরও নাই যাহা দোজখের প্রথমে আসে। এই কারণেই এই সুরায় ৭ (সাত)টি অক্ষর নাই। যথা- ث–ج–خ–ز–ش–ظ–ف (ছে)- ث ছুবুরের প্রথম অক্ষর যার অর্থ বরবাদ বা বিনাশ। ج (জিম্) জাহান্নামের প্রথম অক্ষর যার অর্থ দোজখ। خ (খে)- খিজয়ুনের প্রথম অক্ষর যার অর্থ অপমান। ز (যে) যফিরের প্রথম অক্ষর এবং যাক্কুমের প্রথম অক্ষর। যফিরের অর্থ দোজখীদের আওয়াজ এবং যাক্কুম দোজখীদের খাদ্য। ش (শিন্) শহিকের প্রথম অক্ষর যার অর্থ দোজখীদের আওয়াজ। ظ (যোয়া) যিল্লুন্ এবং যুল্‌মুন্-এর প্রথম অক্ষর।

সুরায়ে ফাতেহার উপকারিতা

সুরায়ে ফাতেহার অগণিত উপকারিতা রহিয়াছে। তন্মধ্যে, এই স্থানে সামান্য বর্ণনা করা হইতেছে। যে ব্যক্তি সুরায়ে ফাতেহা ১০০ বার পাঠ করিয়া দোয়া করিবে আল্লাহ পাক তাহার দোয়া কবুল করিবেন। যে ব্যক্তির রোগ চিকিৎসার বাহিরে অর্থাৎ, যার কোন চিকিৎসা নাই, সে ব্যক্তি চীনা মাটির সাদা পাত্রে যমযমের পানি এবং জাফরানের দ্বারা সুরায়ে ফাতেহা লিখিয়া ধৌত করিয়া ৪১ দিন পর্যন্ত পান করিবে তবে আল্লাহর রহমতে আরোগ্যলাভ করিবে। যদি যমযমের পানি না পাওয়া যায় তবে গোলাবজলের দ্বারা, যদি ইহাও না পাওয়া যায় কুপের পানি লইবে। তাফছিরে কবীরে রহিয়াছে কতক গোনাহ্‌গার মানুষের

অভিমত ইহাই যে, ইমামের পিছনে ফাতেহা পাঠ কখনও সিদ্ধ নহে।

মাসআলা ঃ- জানাজার নামাজে ফাতেহা তেলাওয়াতের নিয়তে পাঠ করা নিষেধ। তবে হাঁ, দোয়ার নিয়তে পড়া যাইবে, জায়েজ আছে। বাকী মাসায়েল ইন্‌শাআল্লাহ্ পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه

অর্থ ঃ- 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য।' এই আয়াতে কারিমায় চারিটি কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। যথা- (১) কোরআনে পাকে সর্বপ্রথম এই আয়াত কেন আসিল? (২) এ আয়াতের আলেমানা ও ছুফিয়ানা তাফছীর কি। (৩) ইহাতে মুসলমানের জন্য কি উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে; এবং ইহাতে কি কি শিক্ষা পাওয়া যায়। (৪) ইহাতে কি কি প্রশ্নমালা রহিয়াছে, এবং ইহাদের উত্তর সমূহ কি কি?

১নং প্রশ্নের উত্তর ঃ- এই আয়াতে কারিমা কোরআনে কারিমের ভূমিকা সুরায়ে ফাতেহার সর্বপ্রথম আয়াতরূপে নাযিল হইবার কতিপয় কারণ রহিয়াছে। যথা- (১) হজরত আদম আলাইহিস্‌সালামকে সৃষ্টি করা মাত্রই তাঁহার সর্ব প্রথম হাঁচি আসিয়াছিল এবং তিনি বলিয়াছিলেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰه رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি সকল সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক।

এই জন্যেই, আমাদের প্রতি আদেশ রহিয়াছে যে, হাঁচি আসিলে পাঠ করিবে- আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর শ্রবণকারী পাঠ করিবে **'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্'**। আবার হাঁচি দাতা উত্তরে বলিবে يَهْدِكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ **- ইয়াহ্‌দিকুমুল্লাহু ওয়া ইউছ্‌লিহ্ বালাকুম্।**

প্রতীয়মান হইল যে, ইহাই কলেমা যাহা সর্ব প্রথম মানুষের মুখে (আদি মানব আদম আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে) নিঃসৃত হইয়াছে, আল্লাহ পাক তাঁহার কালাম ও ইহা দ্বারাই শুরু করিলেন।

(২) الحمد لله **আলহামদুলিল্লাহ'র** মধ্যে ৮ (আট) টি 'হরফ' বা অক্ষর রহিয়াছে। আর বেহেশতের দরজাও ৮টি রহিয়াছে। অতএব, যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তরে উক্ত কালিমা পাঠ করিবে, আল্লাহর ফজলে সে বেহেশতের দরজার অধিকারী হইবে। ইহাতে ঐ দিকেও ইশারা হইতেছে যে, কোরআনে পাক তেলাওয়াত আরম্ভ করা মাত্রই তেলাওয়াতকারী বেহেশতের হকদার হইয়া যায়। তারপর, যত বেশী পাঠ করিবে তত বেশী রহমত ও বরকত লাভ করিবে।

(৩) এবাদতের জান হইল আল্লাহ পাকের প্রশংসা এই জন্যেই, উহা কোরআনে পাকে সর্ব প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে। (৪) ইহাতে মুসলমানের প্রতি এই উপদেশ প্রদান করা হইতেছে যে, প্রত্যেক কাজকর্মই যেন আল্লাহ পাকের নামে

এবং আল্লাহ পাকের প্রশংসার সহিত আরম্ভ করা হয়। কেননা, আল্লাহ্ পাকের কিতাব কোরআন মজীদও আল্লাহপাকের নামের সহিত, আল্লাহ পাকের প্রশংসার সহিত শুরু করা হইয়াছে। (৫) যখন কোন বাদশাহ'র নিকট কোন কিছু চাইতে হয়, তখন প্রথমেই তাহার প্রশংসা করিতে হয়। অনুরূপভাবে, যখনই কাহারও নিকট চিঠিপত্র লেখা হয় তখন তাহার পদবী কিংবা উপাধি লিখিতে হয়। এই হেতু, সুরায়ে ফাতেহায় ও আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তাঁহার বান্দাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আল্লাহ পাকের প্রশংসা-রীতি এবং এবাদত-বন্দেগী তথা যাবতীয় কাজকর্ম শুরু করিবার রীতি।

تفسير (তাফছীর)

এ আয়াতের আলেমানা তাফছীর এই যে, সুরায়ে ফাতেহার মধ্যে তিনটি কালেমা অর্থাৎ শব্দ রহিয়াছে। যথা ঃ لَامْ اَلِفْ - حمد - لله (আলিফ, লাম, লিল্লাহ্) প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা রহিয়াছে। আলিফ লামের মধ্যে দুইটি বিষয় রহিয়াছে। যথা ১নং এই যে, ইহা ইস্তেগ্রাকী। ২নং এই যে, ইহা আহাদী (রুহুল বয়ান)। যদি ইস্তেগ্রাকী হয় তবে এই অর্থ হইবে যে, সমস্ত প্রশংসা প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক অবস্থায়, প্রত্যেক প্রশংসাকারীর পক্ষ হইতে খাছ-আল্লাহ পাকের জন্য প্রশংসা আম (ব্যাপক) হওয়া আলিফ্ লাম্ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। এবং حمد (হাম্দ্) আম (ব্যাপক) হওয়ায় হামেদ বা প্রশংসাকারীর উমুম (ব্যাপকতা) পাওয়া যায়। আর, جمله اسميه (জুম্লায়ে ইছ্মিয়া) দ্বারা সার্বক্ষণিক বুঝাইয়াছে। এক্ষণে, আয়াত বা বাক্যের মর্মার্থ এ-ই হইল যে, যে কেহ প্রশংসা করুক যে অবস্থায়ই করুক, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই হইয়াছে। যে কেহ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিবে ঐ প্রশংসা আল্লাহ পাকেরই প্রশংসা। যদি আল্লাহর কোন সৃষ্টির প্রশংসা করিবে, যেমন-নবী -অলি, চন্দ্র-সূর্য, ইত্যাদি যাহারই প্রশংসা করিবে, প্রকৃত পক্ষে, আল্লাহ পাকেরই প্রশংসা হইবে। কেননা, কোন বস্তুর প্রশংসা প্রকৃত পক্ষে উহার স্রষ্টারই প্রশংসা। কোন ঘরের তারিফ-প্রশংসা মূলতঃ উহার কারিগরেরই প্রশংসা, যে উহা নির্মাণকারী। কোন পত্রের প্রশংসা উহার লেখকেরই প্রাপ্য। তদ্রুপ, দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুর প্রশংসা উহার প্রস্তুতকারীরই প্রশংসা। এইহেতু, আমাদের আক্বা ও মাওলা হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ং আল্লাহ পাকেরই প্রশংসা রহিয়াছে। যখন মুখের দ্বারা (কথায়) প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহ পাকেরই প্রশংসা করা হয়। হাত-পায়ের (কাজ-কর্মের) দ্বারা আযিযি এনকেছারী বা বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করা, যেমন-নামাজ আদায় করা ও রোজা পালন করা মূলতঃ আল্লাহ্ পাকের তারিফ-

প্রশংসা করা। অপরদিকে, আল্লাহ্ পাকের গোলামী করিতে গিয়া মাল খরচ করা যেমন- যাকাত-ছদকা, ফেৎরা কোরবানী করা ইহাও আল্লাহ্ পাকেরই প্রশংসা। কা'বা শরীফের তোওয়াফ, হুজুরে পাকের উচ্চশান, রমজান শরীফের সম্মান, আউলিয়া-আল্লাহর তাবারুক এবং তাঁহাদের মাযার সমূহের সম্মান প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ পাকের আমালী প্রশংসা। কোরআনে পাকে রহিয়াছে যাহার অর্থ ঃ- যে ব্যক্তি আল্লাহপাকের নিদর্শনসমূহের সম্মান করে, তাহা তাহার ক্বালব্ বা হৃদয়স্থিত তাক্বওয়া বা পরহেজগারীর কারণে। রাষ্ট্র, সরকার এবং সরকারী কমকর্তা ও কর্মচারীদিগের সম্মান প্রকৃত প্রস্তাবে রাষ্ট্রেরই সম্মান। তন্মধ্যে যে কোন একটির অসম্মান প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রেরই অসম্মান। যেমন- রাষ্ট্রের কোন অফিস-আদালতের কোনও কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রতি অবমাননা কিংবা অসম্মান প্রদর্শন মূলতঃ রাষ্ট্রের প্রতি অবমাননা ও অসম্মান প্রদর্শন করারই নামান্তর। الف لام আলিফ লাম ইস্তেগ্‌রাকী হওয়ায় এই সমস্ত বিষয়বস্ত নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তদ্রুপ, আল্লাহর নিয়ামত লাভ করিয়া তার শোকরিয়া আদায় করা, দুঃখ-কষ্টে পতিত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করা ইহাও আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা জ্ঞাপন করার শামিল। অতএব, আল্লাহর বান্দার অবশ্য করণীয় হইল সর্ব অবস্থায় সর্বদা আল্লাহ্র প্রশংসা-স্তুতি জ্ঞাপন করা। দুঃখ-কষ্টে পতিত হইলে আল্লাহর প্রশংসা এই জন্যে যে, দুঃখ-কষ্ট আমাদের উপর গোনাহের কারণে আসিয়া থাকে; কাজেই, আল্লাহর প্রশংসায় গোনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায়। যখন গোনাহ্ মিটিয়া যায় তখন দুঃখ-কষ্ট ও বিদূরীত হইয়া যায়। এই হইল সর্ব অবস্থায় প্রশংসার হাকীকত ও কল্যাণ।

ফেকহী-মাসায়েল

ফকীহগণ কতিপয় মাছায়েল বাহির করিয়াছেন। যথা-জুম্মার নামাজের খুতবায় আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করা ওয়াজিব এবং বিবাহের খুতবায় ও দোয়ায় এবং প্রত্যেক জায়েজ কর্মের প্রথমে শেষে এবং পানাহার করার পর আল্লাহর প্রশংসা মুস্তাহাব। হাঁচি আসিবার পর প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

প্রশ্নঃ- আড়িয়া সমাজের লোকেরা ইহাতে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকে। যেমন-(১) ইহা আল্লাহর কালাম নহে, কোন লোকের বানানো; কেননা, যদি আল্লাহর কালাম হইত তবে এমন হইত- اَلْحَمْدُ لِىْ 'আলহামদুলী- (২) আমরা তোমারই উপাসনা করি-আল্লাহ্ আবার কাহার উপাসনা করেন? (৩) খোদা তায়ালা নিজের প্রশংসা নিজেই করেন ইহা তাকাব্বুরী এবং তাকাব্বুরী করা ও ইয়ারকি মারা খারাপ কথা ও অশোভন।

উত্তর ঃ- এই কালাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের জবানে প্রকাশ করানোর উদ্দেশ্যে এই রূপে অবতীর্ণ করিয়াছেন।

যেমন - কোন উস্তাদ স্বীয় ছাত্রদিগকে সামনে বসাইয়া শিক্ষাদানের নিমিত্ত কিতাব সর্ব প্রথম উস্তাদ নিজে পাঠ করেন; যেন ছাত্ররা এইভাবে (আদর্শ-পাঠ অনুযায়ী) পাঠ শিক্ষা করে। কোন সময় হাকিম অন্যের মুখে কথা বলে। জাতীয় সংসদের সদস্যগণের শপথ অনুষ্ঠানের 'ফরম' লিখিত ও ছাপান হয়। ঐ ফরম-এই উল্লিখিত শপথ-বাক্যসমূহ এইরূপ হয়-'আমি শপথ করিতেছি যে, সকল অবস্থায় রাষ্ট্রীয় আনুগত্যসহকারে যাবতীয় আইন-কানুন মানিয়া চলিব-ইত্যাদি ইত্যাদি।' দেখুন, এই ফরমের শপথ-বাক্য প্রস্তুতকারী অন্যজন, কিন্তু পাঠকারী ও শপথকারী সংসদ-সদস্যগণ। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অথবা জাতীয় সংসদের স্পীকার উক্ত শপথ-বাক্য নিজে পাঠকরে সংসদ-সদস্য একেক জনকে ধারাবাহিকভাবে পাঠ করান। এই উদ্দেশ্যে উক্ত শপথ-বাক্য রচনা করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে, এই আয়াতে কারিমার উদ্দেশ্য হইল- **'হে আমার বান্দাগণ। আমার দরবারে আসিয়া এইভাবে কথা বল।'** এক্ষণে, আমাদের কথা হইল (আড়িয়াদের প্রশ্নের উত্তরে) আল্লাহপাক যদি তদীয়, জাত ও ছিফাতের সম্পর্কে আমাদের দ্বারা বর্ণনা না করাইতেন, তবে আমরা কিরূপে আল্লাহ পাকের পরিচয় পাইতাম? অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আড়িয়াদের জানা উচিত ইহা ইয়ারকি নহে, বরং ইহা আল্লাহর পরিচয় প্রদানের উত্তম-রীতি। যেমন- কোন এক বাদশাহ তার প্রজাদেরকে বলেন যে, 'তোমাদের উপর আমার এই এই ক্ষমতা রহিয়াছে। আমি এই এই বিষয়ে মহা-শক্তিমান।' ইহা দ্বারা এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করা হয় যে, প্রজাসাধারণ এই সমস্ত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বাদশাহের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে। আয়াতে কারিমার মর্মার্থও এই উদ্দেশ্যই ব্যক্ত করে। ফলকথা এই যে, আড়িয়া সমাজের এই প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর, বোকামী ও অজ্ঞতাপূর্ণ।

দেওবন্দীদের প্রশ্নঃ দেওবন্দী ওয়াহাবী মোল্লারা বলে যে, এই আয়াতের দ্বারা সর্ব অবস্থায় আল্লাহরই প্রশংসা এবং তাঁহারই জিকির-আজকার করা। উঠতে-বসতে يا رسول الله **ইয়া রাসুলাল্লাহ,** يا غوث **ইয়া গাউছ** বলা কিংবা অন্য কাহারও নাম জপকরা শির্ক।

উত্তর ঃ- আল্লাহ-ওয়ালাগণের প্রশংসা করা এবং তাঁহাদের স্মরণ করা প্রকৃত অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালারই প্রশংসা করা; এবং তাঁহারই স্মরণ করা, বরং আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ প্রশংসা উহাই যে, আল্লাহ পাকের খাছ বান্দা বা প্রিয় বান্দাগণের প্রশংসা তথা জিকির বা স্মরণের মাধ্যমে হইয়া থাকে। যে রূপ, পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। হে দেওবন্দী মোল্লাগণ তোমরা তোমাদের নেতৃস্থানীয় দেওবন্দী মৌলুভীদের উঠা বসায় প্রশংসা করিয়া তোমরা ও মুশরিক হইয়াছ-বলিতে পারি কি?

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ ঃ সমস্ত জগতের মালিক বা প্রতিপালক। প্রশংসার সহিত ইহার সম্পর্ক কয়েক প্রকার। (১) ইহাতে সকল বান্দাগণের প্রতি আল্লাহর প্রশংসা করিবার আদেশ হইয়াছিল; এবং ইহাতে উহার কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। অথবা উহা দাবী ছিল যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ইহার দলীল বয়ান করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সমস্ত-প্রশংসা আল্লাহপাকের জন্যে, কেননা, তিনি সমস্ত জাহানের লালন-পালনকারী। আর যিনি জাহানের লালন-পালনকারী তিনি এহেন প্রশংসার উপযোগী। (২) আল্লাহ পাকের প্রশংসাকারী মানুষ চার প্রকারঃ- যথা-(১) যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহকে রাজী করিবার জন্য তাহার প্রশংসা করে এবং অন্য কাহারও উপকারের প্রতি লক্ষ্য নাই। যেমন- হাজারাত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুচ্ছালাম এবং খাছ আওলিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুর রাহমাত ওয়ার রেদওয়ান। (২) যে ব্যক্তি নিজের উপর আল্লাহপাকের বেশুমার এহছান বা সাহায্য দেখিয়া তাঁহার প্রশংসা করে। যেমন- সর্বসাধারণ শোকর গোজার (কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী) বান্দাগণ। (৩) ঐ সমস্ত মানুষ যাহারা আসন্ন রহমতের আশা পোষণ করিয়া আল্লাহর প্রশংসা করিয়া থাকে। যেমন-সাধারণ গোনাহগার ব্যক্তিবর্গ-গোনাহ্ মাপের আশায়। (৪) ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাহারা আল্লাহর ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর জন্য বলা হইয়াছে - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ **আলহামদুলিল্লাহ।** দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বলা হইয়াছে- رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- **রাব্বিল আলামিন** অর্থাৎ যিনি তোমাদিগকে লালন-পালন করিতেছেন, সর্বদা রিযিক প্রদান করিতেছেন তাঁহার প্রশংসা -স্তুতি (গুণ-কীর্তন) কর, তৃতীয় শ্রেণীর জন্য বলা হইয়াছে- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **আররাহ্মানির রাহীম-** অর্থাৎ, ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতি রহমত (অনুগ্রহ) প্রদান করিবেন এই আশা পোষণ করিয়া তোমরা তাঁহার প্রশংসা কর। আর, চতুর্থ শ্রেণীর জন্য বলা হইয়াছে- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ **মালিকি ইয়াওমিদ্দিন** অর্থাৎ তিনি বাদশাহ'র বাদশাহ্ তোমাদের উপর সর্ব প্রকার ক্ষমতা রাখেন; তাঁহাকে ভয় কর এবং তাঁহার প্রশংসা-স্তুতি কর। ফলকথা, কালামে ইলাহীর বর্ণিত চারিটি বাক্যের অতি উচ্চ মর্যাদার সম্পর্ক ও প্রকাশরীতি বড়ই উত্তম ও চমৎকার। ছোবহানাল্লাহ। رب **রব** শব্দের তিনটি অর্থ - মালিক, সরদার ও প্রতিপালক। তিনটি অর্থই ঐ স্থানে সঠিক ও প্রযোজ্য হইতে পারে। 'মালিক' এই জন্য যে, সমস্ত জগতের মালিক হওয়া, এবং তাঁহার মালিকানা সর্ববিধ ও সার্বক্ষণিক, বরং হাকীকি বা প্রকৃত মালিক তিনিই। ইহা স্বয়ং হক তায়ালার বিশেষ গুণ। অপরদিকে, আল্লাহ পাক যাহাকে মালিক বানান, উহা (মালিকানা) তাহার জন্য ঐশী প্রদত্ত ও সীমিত বুঝিতে হইবে এবং উহা

কোন নির্দ্দিষ্ট সময় হইতে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এবং কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের উপর-আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দান উহা। যেমন-কোন ব্যক্তি তাহার কোন গৃহপালিত পশুর মালিক। কিন্তু সে ব্যক্তি ঐ পশুর সবকিছুর মালিক নহেন। সর্ব সময়ের জন্য মালিক ছিলেন না এবং সর্বক্ষণ মালিক থাকিবেন না-ইহা খোদাপ্রদত্ত অস্থায়ী মালিকানা। আর এই মূলনীতিতে সকল বিষয়ের প্রতি কিয়াস বা সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে। 'সরদার' এই অর্থ এই জন্য সঠিক ও বিশুদ্ধ যে, সরদার কেবল তাহাকেই মান্য করা হয় যিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এই দৃষ্টিকোন হইতে আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু সুনিশ্চিতভাবে, উচ্চ মর্যাদাশীল মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত। বিশ্বজগতে যে কেহ সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্ত হয় তাহা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। এই জন্যে عظيم على আলাও আজীম আল্লাহ পাকের অন্যতম ছিফাতী নাম।

প্রতিপালক বা লালন-পালনকারী এই অর্থ অতি ব্যাপক। যৎ-কিঞ্চিৎ আলোচনা নিম্নে উল্লিখিত হইল যথা-লালন-পালন কাহাকে, কখন হইতে কখন পর্যন্ত করিবেন? ইহাতে জানা গেল যে, যখন হইতে আলম সৃষ্টি হইয়াছে এবং যতক্ষণ আলমের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, তাঁহার লালন-পালনের অনুগ্রহ বারী অনুক্ষণ বর্ষিত হইতে থাকিবে অবিরাম ধারায়। কেমন করিয়া লালন-পালন করেন এই প্রশ্নে তাহার তরফ হইতেই জানা গিয়াছে যে, সর্ব অবস্থায় লালন-পালন। এক্ষণে, মনে করুন জাহেরী লালন-পালনকারীর লালন-পালন ঐ সময় হইতে শুরু হয় যখন তাহার লালিত-পালিত যাহা উহার জন্মলাভ হয়। আবার তাহাও খুবই তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায়। লক্ষ্য করুন, দুনিয়ায় সব চেয়ে বড় লালন-পালনকারী রূপে মাতা-পিতাকে মানিতে হইবে। যে সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন-

كما ربيانى صغيرا **কামা রাব্বাইয়ানী ছোয়াগীরা।**

অর্থাৎ, শৈশবকালে যে পরিমাণ-প্রতিপালন করা হইয়াছে সেই পরিমাণ রহমত বর্ষণ করার আবেদন করিতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদব্যতীত অন্যান্যজনের প্রতিপালন সে তুলনায় অনেক কম। শিশু সন্তান যখন পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে মাতার গর্ভে আগমন করে তখন সর্ব প্রথম নুতফা বা মনি (বীর্য) রূপে থাকে। তারপর, রক্ত পিণ্ড আকারে নির্দ্দিষ্ট সময়, তারপর মাংস খন্ড আকারে একটা নির্ধারিত সময় অবস্থিত থাকে এবং তাহাতে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈয়ার হয়; আবার উহাতে আত্মার উপস্থিতি বা সংযোগ হয়। এই সমস্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ে মাতা-পিতার লালন-পালনের কোনও সম্পর্ক থাকে না। অতঃপর যখন সুষ্ঠরূপে জন্মলাভ হইল, তখন আল্লাহ পাক সন্তানের মায়ের বক্ষস্থলে অতিশয় উৎকৃষ্ট মানের ও পুষ্টিকর দুধের নহর জারী করিয়া দেন। মা শুধু এই কাজটি

করিয়া দেয় যে, আল্লাহর অনুগ্রহের দান স্তনের দুধ সন্তানের মুখে তুলিয়া দেওয়া। তারপর, ঐ দুধ সন্তানের পেটে পৌছিবার পর মা আবার সম্পর্ক শূন্য হইয়া যায়। মাতৃস্তনের দুধ সন্তানের পেটে পৌছিয়া আল্লাহর অপার অনুগ্রহে হজম হইয়া শিশুর দেহের পুষ্টি সাধিত হয় এবং শিশুর পেট হইতে খাদ্যের কিয়দংশ হজম হইবার পর মল মূত্ররূপে বাহির হইয়া আসে। ইহাতে মায়ের কোন সম্পর্ক নাই। মায়ের লালন-পালনের মধ্যে নিয়মিত ভাবেই কিছু কিছু সময় বিরতি ঘটিয়া থাকে। আবার মায়ের বুকের দুধ চালু রাখা ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত, সন্তান বড় হইলে মাতৃস্তনের দুধ বন্ধ করিয়া দেওয়া মায়ের লালন-পালনের দায়িত্ব হ্রাস পাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। অর্থাৎ, মায়ের কোলের শিশু যতই বড় হইতে থাকে মায়ের লালন-পালন ততই কমিতে শুরু করে। পক্ষান্তরে, এমন একটা অবস্থা আসিয়া যায় যখন সন্তান বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করে কর্মক্ষম ব্যক্তিতে পরিনত এবং মাতা-পিতা বৃদ্ধ হইয়া পড়েন। সেই সময় অবস্থা সম্পূর্ণ উল্টা ও বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়, মাতা-পিতা সন্তানের খেদমত বা লালন পালনের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন আর সন্তান নিজেই খেদমতগার (সেবক) হইয়া যায়।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আমাদের জান-মাল সর্বস্ব কোরবান আমার পরম দয়াময় আল্লাহপাকের মহিমান্বিত শান ও আজমতের উপর যাঁহার অতুলনীয় লালন-পালনের মধ্যে কোন তারতম্য হয়না। কোরবান যাও আমার নামে যাঁহার রবুবিয়াত অতিশয় ব্যাপক ও বেনজীর বেমিছাল। যিনি আমাদিগকে দুনিয়ায় আসিবার পূর্বে পিতার পৃষ্ঠদেশে প্রতিপালন করিয়াছেন, তৎপর মায়ের গর্ভে বিভিন্ন অবস্থায় আমাদিগকে লালন-পালন করিয়াছেন। অতঃপর, শৈশবে, মাতৃ-ক্রোড়ে কৈশোরে, যৌবনে এবং বার্দ্ধক্য অবস্থায় বিভিন্ন উপায়ে আমাদিগকে অপার অনুগ্রহে লালন-পালন করিতেছেন। এক্ষেত্রে কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এই জন্যেই তিনি رب العلمين **রাব্বুল আলামিন** জাল্লা শানুহু এ খেতাব একমাত্র তাহারই জন্য যথার্থ ও অনিবার্য। আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রকার লালন-পালনের আঞ্জাম দিয়া থাকেন। আবার শরীরে জাহেরী ও বাতেনী উভয় প্রকারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে। সেই অনুসারে লালন-পালনও জাহেরী বাতেনী উভয় প্রকার। উভয় প্রকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতিপালন বিভিন্ন রীতি ও প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ জান বা প্রাণকে ভিন্ন উপায়ে এবং ঈমানকে ভিন্ন অবস্থায় ও প্রণালীতে মহীয়ান ও গরীয়ান রাব্বুল আলামিন মহা হেকমত ও কৌশল সহকারে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মহা পবিত্র ঐ জাতে পাক জাল্লা শানুহু যিনি হাড্ডি ও কানের পর্দার দ্বারা শ্রবণ করান, চর্বি ও চক্ষুর সুক্ষ্ম প্রত্যঙ্গের দ্বারা দর্শন করান এবং কণ্ঠ, জিহ্বা ও জবান দ্বারা কথা বলান। আবার ঐ সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহকে নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী ও ফলমূল

ইত্যাদি দ্বারা পুষ্ট ও সুস্থ এবং সক্রিয় রাখিয়া উহাদের প্রতিপালন করেন। মোট কথা, যার যেভাবে প্রতিপালন আবশ্যক সেভাবেই তার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বৃক্ষরাজি লতা-গুল্ম ইত্যাদির মধ্যে চলা ফেরার ক্ষমতা নাই; কাজেই উহাদের সেবা যত্নের দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পণ করিয়াছেন। বাদল বা মেঘমালার দ্বারা সমুদ্র হইতে পানি উঠাইয়া বৃষ্টির মাধ্যমে বর্ষণ করিয়া বান্দাদিগকে পান করান। ফলতঃ নিখিল সৃষ্টির মধ্যে যার যা প্রয়োজন হয় রাব্বুল আলামিন জাল্লাশানুহু সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করিয়া থাকেন। পাখিকূলকে চলাফিরা করার শক্তি দান করিয়াছেন, কিন্তু রুজী-রোজগারের নির্দ্দেশ দান করেন নাই। আল্লাহ পাক তাদের নির্দ্দেশ দান করেন বাসায় তোমাদের রিযিক মিলিবে না, তোমরা জমিনে ছড়াইয়া পড়, কৃষকদের জমিনে তোমাদের আহার মিলিবে। সুতরাং পাখিসমূহ সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাহির হয় এবং সন্ধ্যা বেলায় উদর পূর্ণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসে। অপরদিকে, মানবজাতিকে আল্লাহ পাক চলাফিরার ক্ষমতা দান করিয়াছেন এবং রুজী-রোজগার অন্বেষণ ও উপার্জন করার শক্তিদান করিয়াছেন এবং হালাল উপার্জনের আদেশ ও করিয়াছেন। অর্থাৎ- মানুষ পশু-পাখি ও বৃক্ষ লতার ন্যায় অনায়াসে সহজ লব্ধ রিযিক প্রাপ্ত হইবে না বরং চেষ্টা তদবির সহকারে রিযিক লাভ করিবে-ইহা আল্লাহ পাকের কুদ্রতি ফায়সালা। অন্য কথায়, বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখি যে বিষয়ে অক্ষম মানব জাতি সে বিষয়ে সক্ষম। মানুষ ঘর-বাড়ী হইতে রিযিক অন্বেষণে বাহির হইবে, জমিনে বীজ বপন করিবে, ফসল ফলাইবার উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করিবে, আল্লাহ পাক বৃষ্টির পানি ও রৌদ্রের তাপ দ্বারা সাহায্য করিবেন। মানুষ যখন শৈশবে দাঁত শূন্য এবং দূর্বল থাকে তখন তাকে বিনা শ্রমে বিনা কষ্টে সহজ সরল খাদ্য দুধ দ্বারা জীবন রক্ষার ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন করিয়া থাকেন। ফলকথা, যখন যার যা প্রয়োজন তখন রাব্বুল আলামিন তার জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহাতে সর্বপ্রকার লালন-পালনের দলীল সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

স্রষ্টা এবং সৃষ্টির লালন-পালনের পার্থক্য

যদিও কতক বান্দা কতক বান্দাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু সময়ের জন্য লালন-পালন করিতে দেখা যায় তাহাদিগকে মিজাজী অর্থে (বা রূপক ভাবে) রব বলা যায়। কোরআনে কারিমে উহাবর্ণিত আছে। তথাপি, আল্লাহ পাকের লালন-পালনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে।

১নং পার্থক্যঃ বান্দা কাহাকেও কোন উদ্দেশ্যে লালন-পালন করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহপাক বিনা উদ্দেশ্যে লালন-পালন করেন। যদিও মাতা-পিতা সন্তানকে লালন-পালন করেন এ উদ্দেশ্যে যে, বৃদ্ধ বয়সে সন্তান কাজে আসিবে। মালদার

বা সম্পদশালী লোকেরা গরীব লোকদের লালন-পালন করিয়া থাকেন এ উদ্দেশ্যে যে সুনাম অর্জিত হইবে। অথবা এই জন্যে যে, পরকালে সওয়াব পাওয়া যাইবে। বাদশাহ তাহার চাকরদেরকে লালন-পালন করে এবং বেতন দিয়া থাকে।

২নং পার্থক্যঃ- বান্দা কাহাকেও লালন-পালনের ফলে তাহার মালব্যয় হয় এবং কমিয়া যায়। সেই কারণে মাল কমিয়া যাওয়ার আশংকায় সাবধানতা অবলম্বন করে কিংবা সতর্কতার সহিত মাল খরচ করিয়া থাকে। যদি আমদানী কম হয় তবে আয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া বহু চাকরকে বিদায় করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাকের কুদ্রতি ধন ভান্ডারের কোনও কমতি নাই। এই জন্যে আল্লাহর লালন-পালন হইতে কাহাকেও বিতাড়িত করেন না। বঞ্চিত করেন না।

৩নং পার্থক্য ঃ কোন কোন দানশীল ব্যক্তি কাহাকেও লালন-পালন করিয়া তাহার দানের বড়াই করে কিংবা প্রতিদান কামনা করে অথবা উপকারের কথা উল্লেখ পূর্বক খোঁটা দিয়া থাকে। আবার না চাহিলে দান করে না। কিন্তু আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু না চাহিতেই দান করেন। আর এ দান হইতেছে আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহের দান। আল্লাহ পাকের দান অফুরন্ত ও অতুলনীয়। আল্লাহ পাক এত বড় দয়াবান যে, আমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম এবং মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়া মাতৃক্রোড়ে অবস্থান নিয়াছিলাম এবং আমাদের প্রয়োজনীয় কিছুই যখন চাহিবার মত জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তি ছিলনা তখনই আমার দয়াময় আল্লাহ অপরিসীম ফজল ও করমের দ্বারা আমাদের রিযিকের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য যাবতীয় চাহিদা পূরণ করিয়াছেন।

৪নং পার্থক্য ঃ বান্দার পক্ষে সকলকেই লালন-পালন করা সম্ভবপর হয় না। সাধারণতঃ মানুষ নিজেদের সন্তানাদিগকেই লালন পালন করিতে পারে। বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা শুধু চাকর-বাকর লালন-পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু, আমাদের দয়াময় আল্লাহ পাক ধনী-গরীব, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলকেই তথা যাবতীয় মাখলুকাতকেই লালন-পালন করিয়া থাকেন।

৫নং পার্থক্য ঃ দানশীল ব্যক্তিগণ দান করিতে গিয়া যখন দানের প্রার্থী বা ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশী দেখিতে পান তখন অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া পড়েন। কিন্তু আল্লাহ পাক স্বীয় অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দান করিতে মোটেও কুণ্ঠিত হন না; বরং আল্লাহর নিকট যতই প্রার্থনা করা যায় দয়াময় আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন ততই খুশী হন। আল্লাহ পাকের দরবারে ফকীর মিছকিন বাদশাহ-আমীর সকলেই হাজির এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ চাহিদা অনুযায়ী আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের অপার অনুগ্রহের দানলাভ করিয়া থাকে।

ঈসায়ী বা খ্রীষ্টানরা আল্লাহ পাককে 'ফাদার' বা পিতা বলে, আর আমরা আল্লাহপাককে 'রব' অর্থাৎ প্রতিপালক প্রভু বলিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ পাককে পিতা বা বাপ বলিয়া সম্বোধন করা জঘন্য অপরাধ। কেননা, আল্লাহ পাককে 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন করায় আল্লাহ পাকের শানে অবমাননা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয় বরং প্রকারান্তরে আল্লাহ পাককে অস্বীকার করা হয়। এক্ষণে, আল্লাহ পাককে পিতা বা বাপ বলা এ রব বলার মধ্যে কি কি পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বর্ণনা করিব। যথা ঃ-

১নং পার্থক্য ঃ পিতা তাহার সন্তানকে লালন-পালন করিতে হইলে সন্তানের মাতার সাহায্য নিতে হয়। অথবা মাতার অবর্তমানে ধাত্র-মাতার সাহায্যও নিতে হয়। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের লালন-পালননের ক্ষেত্রে কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। এই হেতু যে, আল্লাহ পাক কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন।

২নং পার্থক্য ঃ বাপ কেবল সন্তানের দেহেরই প্রতিপালন করে; কিন্তু, আল্লাহপাক দৈহিক মানসিক তথা সর্ব প্রকার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বাপ সন্তানকে জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার শুরুতে ওস্তাদের কাছে সমর্পন করে কিংবা পীরের হাতে সমর্পন করিয়া এই কথা বলে- 'আমি এতটুক দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করিয়াছি; বাকী যাহা কিছু করিবার আপনি করিবেন। অর্থাৎ, পিতা সন্তানের শারীরিক বৃদ্ধিসাধনে যতটুকু সম্ভব দায়িত্ব পালনের পর শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির দায়িত্বভার ওস্তাদ ও পীরের হাতে ন্যস্ত করিয়া থাকেন-সন্তানের ইহকালীন ও পরকালীন সার্বিক কল্যাণের জন্য।

৩নং পার্থক্য ঃ- বাপের সম্মান দ্বীনি ওস্তাদ ও পীর-মুরশিদের চেয়ে কম। কেননা, বাপ শুধু জন্মদাতা ও একটি দেহবিশিষ্ট প্রাণি হিসাবে গড়িয়া তোলে, কিন্তু দ্বীনের শিক্ষাগুরু সম্মানিত ওস্তাদ ও পীর-মুরশিদ তাকে তালিম-তরবিয়ত (শিক্ষা-দীক্ষা) দ্বারা জ্ঞানী-গুনী মানুষ হিসাবে গড়িয়া তোলে। অন্য কথায়, পিতা আমাদিগকে উর্ধ্বজগত 'আলমে আরওয়াহ' বা রুহের জগত হইতে নিম্ন জগত 'আলমে আজছাম' বা দেহজগতে আনয়ন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ওস্তাদ এবং পীর মুরশিদ যথার্থ শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে নিম্নজগত হইতে উর্ধ্বজগতে পৌছাইয়া দিয়া থাকেন। যদি সেই সম্মানিত ব্যক্তিগণের সাহায্য না হইত, তবে দোজখে যাওয়া সুনিশ্চিত হইত। বাপ-শুধু সন্তানের দৈহিক গঠনে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু পীর-ওস্তাদ তাহাকে দ্বীন ও ঈমান দান করিয়া মহা উপকার করিয়াছেন। শরীর বা দেহ ইহকালীন অস্থায়ী সম্পদ যাহা নষ্ট হইয়া যায়। আর দ্বীন ও ঈমান অতি মহা

মূল্যবান সম্পদ যাহা চিরকালের সঙ্গী। এই জন্যে আদেশ মানা এবং আদাব ও সম্মানের ক্ষেত্রে পীর ওস্তাদই বড়, যদিও হক বা অধিকারের ক্ষেত্রে মাতা-পিতা অগ্রগামী। কিন্তু আল্লাহপাকের দরবারে এই ধরনের প্রশ্নই হইতে পারে না। কেননা, আল্লাহর প্রতিপালনের মধ্যে কোন অংশ বা বন্টন নাই।

৪ নং পার্থক্য ঃ বাপ ও সন্তানের মধ্যে জাতীয়তা ও প্রকারভেদের তারতম্য রহিয়াছে। অর্থাৎ, সন্তান ও বাপের মধ্যে এক জাত হইতে হয়। মানুষের সন্তান মানুষ, ঘোড়ার বাচ্চা ঘোড়া, গরু ও গাধার বাচ্চা যথাক্রমে গরু ও গাধা। মানুষের পেট হইতে কীট বাহির হয় তদ্রুপ, মাথার চুলে উকুন হয় কিন্তু এগুলি মানুষের আওলাদ নহে। কারণ, এগুলো মানুষের জাত নহে। অনুরূপভাবে, সৃষ্টি স্রষ্টার জাত নহে এবং স্রষ্টার কোনও ছিফাত বা গুণের শরীক নহে। অতএব, নাছারা বা খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস রব বা প্রতিপালক প্রভুকে বাপ বলিয়া সম্বোধন করা এবং সৃষ্টজীব খ্রীষ্টানদের প্রভুর সন্তান বলিয়া দাবী নিরেট অজ্ঞতা ও মুর্খতা বরং শিরক ও কুফুরী-অমার্জনীয় অপরাধ; যার পরিনাম অনন্তকাল জাহান্নামের ভয়ানক শাস্তি।

৫নং পার্থক্য ঃ বাপ এবং সন্তান উভয়েই একে অপরের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাঁহার ছিফাতের মধ্যে কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, বরং সকল সৃষ্টিই আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী।

লালন-পালনঃ- আম এবং খাছ

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের লালন-পালন আম-খাছ উভয় প্রকারেই প্রকাশ পাইয়াছে এবং পাইতেছে। আল্লাহর কতক নিয়ামত এমন রহিয়াছে যাহা সকলেই সমানভাবে লাভ করিতেছে। ইহাতে কোন প্রকারের তারতম্য নাই। ইহাই আম বা সাধারণ নিয়ামত। যেমন-সূর্যের কিরণ (রৌদ্র), চাঁদের আলো (জ্যোৎস্না), বাতাস বৃষ্টি এবং আকাশের মেঘের ছায়া ইত্যাদি। আবার, এমন কতক নিয়ামত রহিয়াছে যাহা খাছ খাছ বা বিশিষ্ট লোকজন লাভ করিয়া থাকেন। বিশেষ অবস্থায়-রিযিক, মাল-দৌলত, আওলাদ, ইজ্জত-সম্মান এবং বাদশাহী ইত্যাদি।

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্লাহ পাকের খাছ ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। যাঁহার সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে ইরশাদ করিয়াছেন-

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(ওয়ামা আরছালনা-কা ইল্লা-রাহমাতাল্লিল আলামিন)।

অর্থঃ হে প্রিয়নবী! আপনাকে সকল সৃষ্টির জন্যে রহমত রূপে প্রেরণ করিয়াছি।

অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا

(লিয়াকুনা লিল্ আ-লামিনা নাজীরা)

অর্থ ঃ (হে নবী!) যেন তামাম জাহান (আপনার মাধ্যমে) সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে।

রাব্বুল আলামিনের কালামে ইলাহীর ঘোষণা মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, রাব্বুল আলামিনের রবুবিয়াত বা লালন-পালনের পরিমাণ যত রাহমাতুল্লিল আলামিনের রহমতের পরিমাণ ও তত। অর্থাৎ, আলম বা সৃষ্টির পরিধি যতদূর বিস্তৃত, আল্লাহ পাকের রবুবিয়াত এবং রাসুলে পাকের রহমত ততদূর বিস্তৃত। তামাম মাখলুকাত যেরূপভাবে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের লালন-পালনের মুখাপেক্ষী; তদ্রুপ, হুজুর রাহমাতুল্লিল্ আলামিনের রহমতেরও মুখাপেক্ষী।

হুজুরে পাক ছাহেবে লাওলাক আলাহিসসালাতু ওয়াসাল্লামের রহমত (অনুগ্রহ) একদিকে আম (সাধারণ); যেমন-কালেমা, কাবা, কোরআন, ঈমান ইত্যাদি সকলকেই দান করিয়াছেন। অপরদিকে, বেলায়াত, কুতুবিয়াত, গাউছিয়াত এবং শাহাদাত প্রভৃতি খাছ খাছ নিয়ামত (বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ) হুজুরে পাক আলাইহিস সালামের দরবার হইতে বন্টন হইয়াছে।

اَلعَالَمِيْنَ আল আলা আমিন عالم

আলমের বহুবচন। আলম علم আলম হইতে বাহির হইয়াছে। যাহার অর্থ-নিশান। দুনিয়াকে আলম এই জন্য বলা হয় যে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুদ্বারা আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়, মোটকথা, নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ পাক ছাড়া সমস্ত সৃষ্টিকেই পৃথক পৃথক ভাবে এক একটি আলম এবং সমষ্টিগত ভাবে আলামিন বলা হয়। তাফছীরে রুহুল বয়ান শরীফে এই জায়গায় বর্ণিত হইয়াছে ১৮ (আঠার) হাজার আলম। এই দুনিয়া অর্থাৎ, জমিন ও আছমান যাহা আমরা দেখিতেছি তন্মধ্যে একটি আলম। তদ্রুপ, 'আলমে আরওয়াহ (রুহের জগত), 'আলমে অজছাম' (দেহজগত) পৃথক পৃথক জগত। অনুরূপ, আলমে ইমকান, 'আলমে ছুফলী, 'আলমে উলুভী' এবং আলমে মালাকুত, আলমে নাছুত, আলমে জিন্নাত, আলমে ইনছান, আলমে মালায়েকা এবং আলমে বরজখ প্রভৃতি। এ দুনিয়াতো ঐ সমস্ত আলম সমূহের মধ্য হইতে সব চেয়ে ছোট একটি আলম। বেহেস্ত এতবড় ও বিশাল যে, উহাতে সমস্ত জমিন ও আছমান যদি রাখা হয়, তবে মনে হবে যেন এক বিরাট ময়দানে কয়েকটি সরিষার দানা পড়িয়া রহিয়াছে। অপরদিকে দোজখের গভীরতার এই অবস্থা যে, যদি একটি পাথর উহাতে নিক্ষেপ করা যায় তবে ৭০ (সত্তর) বৎসরে ঐ পাথরটি উহার নীচে পৌছিবে। অথচ ঐ পাথর যদি আকাশ হইতে নিক্ষেপ করা যায় তবে উহা জমিনে পৌছিতে সময় লাগিয়ে ১২ (বার) ঘন্টা।

আবার, এই আলম যাহা আমরা দেখিতে পাই ইহাতেও হাজার প্রকার ছোট-বড় সৃষ্টি রহিয়াছে যাহা সম্পর্কে আমরা অবগত নহি। তাফছীরে রুহুল বয়ানে এই

স্থানে রহিয়াছে যে, মানুষই ১২৫ (একশত পঁচিশ) প্রকার। তন্মধ্যে, এক প্রকার এমন যাদের কাণ হাতির কানের ন্যায় বৃহৎ। আবার, কতক এমনও রহিয়াছে যাহারা পায়ের দ্বারা চলা-ফিরা করিতে পারে না। আবার কতক এমনও রহিয়াছে যাদের চক্ষু বুকের মধ্যে। কতক মানুষ এমন যে, উহাদের মাথা কুকুরের মাথার মতো। কতক মানুষের ছবি যাহা দেখিলে মানুষ হয়রান-পেরেশান হইয়া যায়। এক্ষণে চিন্তার বিষয়, ঐ সমস্ত আলমের খবরই যখন আমাদের জানার বাহিরে তখন ঐ সমস্ত আলমের লালন-পালনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আড়িয়া সম্প্রদায়ের প্রশ্ন-

১নং প্রশ্নঃ আল্লাহ যদি বস্তুতঃই সমস্ত সৃষ্টির প্রতি পালক হইয়া থাকেন তবে মুসলমানদের দ্বারা হত্যা করান কেন? রব আল্লাহর কাজ তো প্রতিপালন করা, হত্যাতো নহে।

উত্তর ঃ যে অনুপযুক্ত সৃষ্টি অপর উচ্চস্তরের সৃষ্টজীবের লালন-পালনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাকে হত্যার মাধ্যমে পৃথক করিয়া দেওয়াও রব তায়ালার রবুবিয়াত বা প্রতিপালনের অন্তর্ভুক্ত। কৃষকদের ফসলের জমিতে কিছু কিছু সুন্দর ও নরম আগাছা জন্মিয়া থাকে; দেখিতে ফসলের সহিত আপাতঃ দৃষ্টিতে উহা ভালই মনে হয়। কিন্তু কৃষকগণ ঐ সুন্দর আগাছাগুলিকে দেখিয়া যখন বুঝিতে পারেন যে, উহারা ফসলকে নষ্ট ও বরবাদ করিয়া দিতে পারে তখন তাহারা আগাছা সমূহ সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। কেননা, উহাতে জমি ও ফসলের উভয়বিধ মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। তদ্রুপ, কাফের ও মুশরিক আল্লাহ পাকের জমিনের উপর অসুন্দর অকল্যাণকর আগাছা স্বরূপ; উহাদের প্রতাপ যদি অধিক বৃদ্ধি পাইয়া যায়, তবে আল্লাহর খাঁটী বান্দাদের জমিনে শান্তি স্থাপনে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। স্বভাবতঃই তখন তাদেরকে আগাছার ন্যায় উচ্ছেদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। উহা যেন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের বান্দাদিগের প্রতিপালনের সুবিধার্থে 'দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন' এ নীতির বাস্তবায়ন।

২নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহর কাজ লালন-পালন করা, দুঃখ-কষ্ট আসিবে কেন?

উত্তর ঃ আল্লাহ পাক স্বীয় খাছ বান্দাগণের প্রতি দুঃখ কষ্ট দিয়া থাকেন। যেমন- রোগ-ব্যাধি এবং দরিদ্রতা ইত্যাদি। এক্ষণে, জানা দরকার যে, এ ধরনের দুঃখ-কষ্ট বা রোগ-ব্যধি ও দরিদ্রতা ইত্যাদির মধ্যে বহু হেকমত বা রহস্য নিহিত রহিয়াছে। কোন সময় দুঃখ-কষ্টের দ্বারা বান্দাদের গোনাহের কাফফারা হইয়া যায় এবং ইহাতে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার ফলে বান্দাগণের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কোন সময় এ সাময়িক কষ্টের ফলে অতীব কল্যাণ ও শান্তির দ্বার উদঘাটিত হইয়া যায়।

যেমন-যাকাত প্রদানের ফলে আপাতঃ দৃষ্টিতে সম্পদের অকারণে ব্যয় পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু ইহার বদৌলতে দরিদ্র জনসাধারণের বিরাট উপকার সাধিত হয়। যাকাত প্রদানকারীর সম্পদের মধ্যে বরকত লাভ হয়। অন্যকথায়, ফলবান বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা সময় সময় কাটিয়া-ছাটিয়া দেওয়া হয়, যেন আগামী মৌসুমে অধিক পরিমাণ ফল পাওয়া যায়। ইহা বৃক্ষ ও উহার রক্ষণা-বেক্ষণকারী মালিকের কদর ও ফায়দা পরোক্ষভাবে অবশ্যই নিহিত আছে। সাধারণ রোগ-পীড়ার কারণে বহু বহু মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ইহা জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। অনেক সময় কোন বিষয়ের প্রারম্ভিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ উহা নাপছন্দ করিয়া থাকেন; অথচ ইহার পরিনাম খুবই ভাল ও সন্তোষজনক। পিতা তাহার অতি প্রিয় সন্তানের এলেম ও হেকমত শিক্ষার ব্যাপারে তাকে অত্যন্ত পরিশ্রমের ভিতর নিয়োজিত রাখেন, এবং নিয়মিত মাদ্রাসায় যাওয়া-আসা, পড়া-শোনার কষ্টকর সাধনায় কিংবা শিক্ষকগণের কড়া-শাসন ইত্যাদিতে অনেক সময় কেহ কেহ ভীত হইয়া পাড়েন; কিন্তু বৎসরান্তে ইহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে সক্ষম হন এবং আনন্দ অনুভব করেন যে, এ কষ্টসাধ্য ব্যাপারটি আসলে তিক্ত ঔষধের মতই উপকারী।

৩নং প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ পাক যদি রাব্বুল আলামিন হইয়া থাকেন, তবে বান্দার সকল প্রকার প্রার্থনা কবুল করেন না কেন? বহু সময় লক্ষ্য করা যায় যে, দোয়া করিতে করিতে মানুষ হয়রান-পেরেশান হইয়া যায়, অথচ দোয়া কবুল হয় না।

উত্তর ঃ- বান্দা জ্ঞানের স্বল্পতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন এমন ঔষধ চায় যাহার পরিনাম ভয়ানক খারাপ। আল্লাহ পাক عليم و خبير আলিম ও খাবীর অর্থাৎ, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন সর্বজ্ঞ ও সর্ব বিষয় পরিজ্ঞাত। সুতরাং আল্লাহ স্বীয় বান্দার প্রতি পরম দয়াবান হইয়াই বান্দার অবাঞ্ছিত প্রার্থনা কবুল করেন না। ইহা বান্দার প্রতি আল্লাহর অবিচার কোন ক্রমেই নহে। অনেক সময় অবোধ সন্তান পিতার নিকট মধু চাহিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানবান পিতা জানেন সে সময় তার জন্যে মধু ক্ষতিকর হইবে; তাই তিনি সন্তানের ইচ্ছা পূরণ করিতে নারাজ হন। ইহাতে সন্তানের প্রতি দরদ কম বলিয়া প্রমানিত হয় না। জ্ঞানহীন রোগী প্রায় সময় ডাক্তারের নিকট স্বাদ যুক্ত ঔষধ তিক্ত ঔষধের পরিবর্তে চাহিয়া থাকে কিংবা সময় সময় যাহা কুপথ্য রোগী তাহাই মুখরোচক ও সুস্বাদু খাবার হিসাবে গ্রহণ করিতে চায়; কিন্তু ডাক্তার তাহা মঞ্জুর করেন না। ইহাতে ডাক্তার রোগীর অবিচার না করিয়া রোগীর মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকেন।

৪নং প্রশ্ন ঃ 'রব' শব্দের অর্থই লালন-পালনকারী, কাজেই আল্লাহ যখন সকলেরই রব বা প্রতিপালক, তখন সকলেরই লালন-পালন করা আবশ্যকীয়-

প্রমাণিত হয়। তাহা হইলে কাহারও মৃত্যু না দেওয়া কি আশ্যকীয় নহে? আর মৃত্যু দেওয়া কি লালন-পালনের বিপরীত নহে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে সে মৃত্যুর হাকিকত বা রহস্য সম্পর্কে অবগত নহে। বস্তুতঃ মৃত্যু বন্ধুর সহিত মিলনের একটি সেতুবন্ধন মাত্র। মৃত্যুর দ্বারা মানুষ দুনিয়ার মুছিবত (বিপদাপদ) হইতে নিস্কৃতি পায়, এবং দুনিয়ার নেককাজ বা পূণ্য কর্মের ফলাফল লাভ করে। উপরন্তু, মৃত্যুর মাধ্যমে মুমিন-বান্দা তাহার মাহবুবে হাকীকী বা প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে এবং প্রাণাধিক প্রিয়তম নবী সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জিয়ারত নছীব হয় মৃত্যুর সেতু বন্ধন দ্বারাই।

অনুরূপভাবে, মানব জিন্দেগী একটি ফসলের জমিন স্বরূপ। মৃত্যু সেই জমিনের ফসল কাটায় সহায়ক। বস্তুতঃ জমিনের ফসলের লালন-পালনের পরিপূর্ণতা তখনই আসে যখন উহার ফসল কাটা হয়। তদ্রুপ, মানবজীবন উপার্জন করিবার বা সম্বল সংগ্রহের যথাযথ সময় এবং মৃত্যু তাহার ফল লাভের নির্ধারিত সময়। মৃত্যুর দ্বারা জীবনের অবসান হইলেও পরবর্তী জীবনের সূচনা এবং উপার্জিত ফল ভোগের উপযুক্ত ও সুনির্ধারিত সময় মৃত্যুর মাধ্যমেই শুরু হয়।

দেওবন্দী-ওয়াহাবীদের প্রশ্নঃ- যেহেতু আল্লাহ পাক رب العلمين রাব্বুল আলামিন, কাজেই সমস্ত কিছু কেবল আল্লাহর কাছেই চাওয়া দরকার। যাহারা আল্লাহ ছাড়া নবী অলিগণের কাছে কোন কিছু চায়, তাহারা আল্লাহ পাককে রাব্বুল আলামিন হিসাবে মানে না।

উত্তর ঃ- আল্লাহ পাকের খাছ বান্দাহগণের নিকট চাওয়া হাকীকতে আল্লাহ পাকের কাছেই চাওয়া হয়। কেননা, তাহারা আল্লাহ পাকের রবুবিয়াত বা লালন পালনেরই প্রকাশক। একথা সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ পাক رب العلمين রাব্বুল আলামিন-সারা জাহানের প্রতিপালক رازق রায্যাক-রিযিকদাতা, شافى الامراض শাফীউল আমরাজ রোগ নিরাময়কারী। কিন্তু আল্লাহ পাক জাল্লাহশানূহু তদীয় প্রতিপালন, রিযিক প্রদান ও রোগ নিরাময়ের নিমিত্ত বিভিন্ন দরজা বা যথাযথ মাধ্যম নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ নির্ধারিত মাধ্যম বা দরজায় গিয়া প্রার্থনা করা হাকীকতে আল্লাহ পাকের কাছেই প্রার্থনা করা হয়। এইহেতু, মানুষ রিযিকের অন্বেষণে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়; রোগ ব্যধির চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ডাক্তারের কাছে এবং ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য কোর্ট-কাচারীতে যায়। ইহাতে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের ক্ষমতা ও গুণাবলীর অস্বীকার হয় না। শায়খ সাদী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন ঃ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ অর্থ ঃ-যিনি দয়াময়, পরম করুনাময়।

ইহার সম্পর্ক রাব্বুল আলামিনের সহিত কতিপয় কারণে রহিয়াছে।

প্রথমতঃ এই বাক্যে ইরশাদ হয়েছিল যে, আল্লাহপাক সারা জাহানের প্রতিপালক। লালন-পালনের ক্ষেত্রে সচরাচর এ ধারনা উদয় হইতে পারে যে, লালন-পালনকারীর মধ্যে হয়তো বা লালন-পালনে অপারগতা থাকিতে পারে কিংবা লালন-পালন বাধ্যতামূলকও হইতে পারে। যেমন-বাদশাহ্ তাহার চাকর-বাকরদের লালন-পালন করিয়া থাকেন; অন্যথায় তাহার বাদশাহী অচল হইয়া যাইতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তি তাহার গৃহ-পালিত পশুগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে এবং অপারগ হইয়া প্রতি পালন করিয়া থাকেন নতুবা তাহার কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। তবে, এই স্থানে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহপাক সারা জাহানকে লালন-পালন করিতে মোটেও অপারগ নহেন। আল্লাহ পাক স্বীয় রহমতের দ্বারাই কেবল লালন-পালন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়তঃ লালন-পালন কোন সময় রহমতের সহিত, আবার কোন সময় গজবের সহিতও হইয়া থাকে। যেমন-জেলখানায় কয়েদীদিগকে সরকার যে ধরনের লালন-পালন করিয়া থাকেন, যদিও খানা-পিনা নিয়মিতই দেওয়া হয় তবু তাহা কয়েদখানার শাস্তি মূলক ও কঠোরতার মাধ্যমেই দেওয়া হয়। কিন্তু, এই স্থানে কালামে ইলাহীর ঘোষণা হইল আল্লাহ পাক লালন-পালন করেন অপরিসীম রহমতের দ্বারা।

তৃতীয়তঃ প্রশংসার সহিত রহমতের সম্পর্ক খুবই নিকটতম ও নিবিড়। এইহেতু, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার প্রশংসা করে নিশ্চয়ই সে রহমত পায়। হজরত আদম আলাইহিস সালামের জন্ম হইবা মাত্রই তাঁহার হাঁচি আসিয়াছে এবং তিনি বলিয়াছেন اَلْحَمْدُ لِلّٰه 'আল-হামদুলিল্লাহ' এবং তৎক্ষণাৎ ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে উত্তর আসিয়াছে يَرْحَمُكَ اللّٰه **ইয়ারহামুকাল্লাহ**। হজরত আদম আলাইহিস সালামের ঐ সুন্নত (আদর্শ) আজও প্রচলিত রহিয়াছে।

রহমান ও রাহীম-এর তাফছীর ঃ-

'রহমান' ও 'রাহীম' আল্লাহ পাকের এ দুইটিগুণ বাচক নাম, ইহার তাফছীর বিসমিল্লাহির্ রাহমানির রাহীম-এর তাফছীরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জায়গায় সামান্য আলোকপাত করা হইতেছেঃ- رَحْمٰن রাহমান-এর অর্থ ইহাও করা হইয়াছে যে, এই প্রকারের রহমত বা করুনা প্রদর্শনকারী যাহা বান্দাদের দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না এবং رَحِيْم রাহীম-এর অর্থ-এই ধরনের রহমত প্রদর্শনকারী যাহার কিছু না কিছু বান্দাগণের দ্বারাও হইতে পারে। তদ্রুপ, রহমান, তিনিই বিনা মাধ্যমে যিনি রহমত বা অনুগ্রহ প্রদর্শন কারী। আর রাহীম তিনিই হইতেছেন, যিনি বান্দাগণের মাধ্যমে রহমত বা করুনা প্রদর্শনকারী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ প্রাণী নিজ নিজ মা-বাপের মাধ্যমে লালিত-পালিত হইয়া থাকে। কিন্তু কাকের বাচ্চা যখন ডিম হইতে বাহির

হইয়া আসে তখন উহার মা উহা হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিহীন হইয়া পৃথক হইয়া পড়ে। ঐ বাচ্চা একটা গোশতের টুকরা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় যাহাতে দলবদ্ধ হইয়া মাছি বসিতে থাকে; আর ঐ গোশতের টুকরা মাছি সমূহ খাইয়া ফেলে। যখন ঐ বাচ্চার দেহে পালক গজাইয়া উঠে তখন উহার মা উহাকে প্রতিপালন করিতে আসে (রুহুল বয়ান, তফছীরে কবীর)। হুজুর জুন্নুন মিসরী রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহি বলেন যে, একদিন নীল দরিয়ার তীরে যাইতেছিলাম। হঠাৎ একটি বিচ্ছু দ্রুতবেগে নদীর দিকে আসিতে দেখিতে পাইলাম। যখন ঐ নদীর কিনারে পৌছিল তখন একটি কাছিম (কচ্ছপ) কিনারে আসিল; ঐ বিচ্ছুটি কাছিমের পীঠে ছওয়ার হইয়া নদীর অপর তীরে পৌঁছিয়া গেল। হজরত জুন্নুন (রহমতুল্লাহ আলাইহে) বলেন বিচ্ছুটির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আমার ইচ্ছা হইল, সামনে কোন আশ্চর্য ধরনের ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা প্রত্যক্ষ করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি নৌকাযোগে দরিয়া অতিক্রম করিয়া অপর তীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম কিছু দূরে একজন যুবক নিদ্রামগ্ন অবস্থায় শায়িত আছে। একটি প্রকান্ড বিষধর সর্প যুবকটিকে দংশন করিতে চাহিলে বিচ্ছুটি সর্পকে হামলা করে। ফলে, উভয় হিংস্র ও বিষধর প্রাণী একে অপরের বিষাক্ত ছোঁবলে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আর ঘুমন্ত যুবকটি প্রাণে বাঁচিয়া রহিল। আমিও দিনের বেলায় জাহেরী অবস্থায় নিজের হেফাজত করিয়া থাকি, এবং রাত্রিকালে যখন শুইয়া নিদ্রা যাই তখন আল্লাহ ছাড়া আমার হেফাজত আর কে করিবে। বহু বিপদাপদ যাহা আমাদের জাহেরী চেষ্টায় দূরীভূত হইয়া যায়, আর বহু বিপদাপদ আছে যাহা হইতে আমাদিগকে একমাত্র আল্লাহ পাকই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা আল্লাহ পাকের অপার মহিমা ও দয়ার প্রকাশ। ইহা আল্লাহ পাকের দয়া ও করুণার প্রমান রহিয়াছে। মুশরিকদের আকীদা হইল বড় বড় নিয়ামত আল্লাহ দিয়া থাকেন। আমাদের আকীদা হইল যে, ছোট-বড় সর্ব প্রকার নিয়ামতই আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের দান।

আড়িয়া সম্প্রদায়ের প্রশ্ন

১নং প্রশ্ন ঃ- যখন বিছমিল্লাহ'র মধ্যে 'রাহমান' ও 'রাহীম' এই দুইটি শব্দ আসিয়াছে তবে, এই স্থানে এ দুইটি দ্বিতীয় বার কেন আনা হইয়াছে?

উত্তর ঃ- বিছমিল্লাহর মধ্যে এই দুইটি শব্দে আল্লাহ পাকের জাতী (সত্তাগত) রহমতের বর্ণনা ছিল, আর এই স্থানে সিফাতির বর্ণনা। কোরআনে কারিমে সেই বিষয়ের বর্ণনা বার বার আসিয়াছে ইহাতে উদ্দেশ্য এই রহিয়াছে যে, বান্দাগণ সহজে বুঝিতে সক্ষম হয়, এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে। উপরন্তু, বার বার উল্লেখ করা আল্লাহ পাকের পছন্দ।

২নং প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ পাক রাহমান এবং রাহীম, তবে দোজখও কষ্টদায়ক বস্তু

ও প্রাণ-নাশক হিংস্র জন্তু কেন সৃষ্টি করিলেন? এবং শয়তানকেই বা কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিলেন?

উত্তর ঃ রাব্বুল আলামীনের ব্যাখ্যায় ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই স্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি যে, কতিপয় মুছিবত রহিয়াছে যাহার দ্বারা আল্লাহ পাকের রহমতের প্রকাশ করা হয়। যে মুছিবত রহমতের বিনিময়ে আসে উহা প্রকৃত প্রস্তাবে অফুরন্ত রহমত বা অনুগ্রহ। যদি দুঃখ-কষ্ট সৃষ্টি না হইত, তবে আমাদের দেহের ও আত্মার পূর্ণ পবিত্রতা সাধিত হইত না। নামাজ, রোজা, হজ্জ-যাকাত বাহ্যিক দৃষ্টিতে কষ্টদায়ক মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাতে রুহ্ বা আত্মাকে যথার্থরূপে পবিত্র করা হয়। এই জন্য এই ধরনের কষ্টদায়ক বিষয় একান্তভাবে কাম্য ও অনিবার্য। যেমন-মরিচাযুক্ত লোহাকে অগ্নিতে ফেলিয়া এবং হাতুড়ীর আঘাত দ্বারা মরিচা দূর করতঃ উহাকে পরিস্কার ও খাঁটী করিতে হয়। আর পরিচ্ছন্ন লোহাকে আগুনে ফেলিয়া উত্তপ্ত করিয়া এবং হাতুড়ী দ্বারা পিটাইয়া বহু মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী তৈয়ার করা হয়। ঘড়ি কিংবা কোন মেশিনের লোহা সামান্য ও অল্প মূল্যের বটে, কিন্তু উহা কারিগরের হাতে পৌছিয়া উহা মূল্যবান যন্ত্রাংশে পরিনত হইয়াছে। স্বর্ণ যদিও মূল্যবান ধাতু বটে; কিন্তু যদি উহা স্বর্ণকারের হাতে না পৌঁছে এবং অগ্নিতে দগ্ধ না হয় এবং কারিগরের হাতের হাতুড়ীর আঘাত না খায় তবে উহা কখনও মূল্যবান অলংকারে পরিনত হইতে পারে না এবং মানুষের গলায় অতিশয় যত্ন সহকারে ব্যবহৃত হইতে পারে না। অতএব, এ সাময়িক কষ্টও স্বর্ণের জন্য কদর বা সমাদর। অনুরূপ ভাবে, গোনাহ্গারের গোনাহের ময়লা আবর্জনা বিদূরীত করার এক সহজতর পন্থা হিসাবেই দয়াময় আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাঁহার বান্দাদিগকে দুঃখ-কষ্ট ও বালা মুছিবত ইত্যাদি দিয়া থাকেন। বান্দাকে তখন লোহার ন্যায় কষ্ট স্বীকার করিয়া খাঁটী হইতে হয়। অপরদিকে, আল্লাহপাকের প্রিয় বান্দা অলি-আল্লাহদিগকে দুঃখ-কষ্ট দ্বারা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় ফেলিয়া স্বর্নের ন্যায় মূল্যায়ন করেন; অধিকতর মর্যাদা ও কোরবতে ইলাহী (আল্লাহর নৈকট্য) লাভে ধন্য করিয়া থাকেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন। প্রকৃতপক্ষে, দুঃখ-কষ্ট আল্লাহ পাকের রহমত স্বরূপ, শাস্তি নহে। কষ্টদায়ক বিষাক্ত জিনিস বহু বড় বড় বিপদাপদ হইতে মুক্ত হইতে সহায়তা করিয়া থাকে। মশা-মাছি প্রভৃতি মানুষের শরীর হইতে দূষিত রক্ত চুষিয়া বাহির করিয়া নেয়। কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ফসলের জমিনের এবং ফসলের দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থ নিয়া যায় বা নষ্ট করিয়া ফেলে। উপরন্তু, আল্লাহপাক গরম খাদ্য-সামগ্রীকে ঠান্ডায় রূপান্তরিত করিয়া খাওয়ার যোগ্য করিয়া দেন। আল্লাহপাক তদীয়, অপার অনুগ্রহের বদৌলতে শুধু মানব জাতীর উপরেই রহমত বা করুনা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহাই নহে, বরং

সকল সৃষ্টির প্রতিই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন ও রাহমানুর রাহীম।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

মালিকিইয়াওমিদ্দীন- অর্থাৎ কিয়ামতের দিন বা কর্মফল দিবসের মালিক বা প্রভূ।

আয়াতের সম্পর্কঃ এ আয়াতের পূর্বে আল্লাহ পাক ত্বদীয় লালন-পালন এবং রহমত বা অনুগ্রহের বর্ণনা করিয়াছেন। রহমতের আলোচনা আগে এবং ভয়-ভীতির প্রসঙ্গ পরে। যাহাতে কালামে ইলাহী শ্রবণকারীর অন্তরে আশা-ভরসার সাগরে ঢেউ খেলিতে পারে; কাজেই, কুদ্রতী ফায়সালা অনুযায়ী রহমতের আলোচনার পর পরই ভয় ভীতির প্রসংগ আলোচিত হইয়াছে। কেননা, ঈমান রূপ মহামূল্যবান সম্পদ ভয় ও আশার মাঝামাঝি অবস্থায় স্থিতিশীল হয়। এ আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ পাকের মিলকিয়াত বা মালিকানার কথা বলা হইয়াছে।

ঈসায়ী বা খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত আকীদা হইল "দুনিয়ায় যত পাপ করা যায় কোনও শাস্তি হইবে না; কেননা, হজরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম মা আজাল্লাহ শূলিতে চড়িয়া প্রাণ উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পাপের কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্য করিয়াছেন। ভ্রান্ত-বিশ্বাসী খ্রীষ্টানরা আল্লাহর রহমতের উপর মনগড়া ভাবে ভরসা স্থাপন করিয়াছে এবং আল্লাহর গজবের প্রতি নির্ভয় হইয়া পাপের পথে গা ভাসাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না, ভয় করে না। অথচ ইহা ভ্রান্ত ও জঘন্য ধারনা এবং পরকালে ইহার পরিনাম ভয়াবহ।

আড়িয়া সমাজের ভ্রান্ত ধারনা এই যে, কোনও পাপের মার্জনা নাই; সকল পাপীই শাস্তিযোগ্য। ইহারা আল্লাহ পাকের রহমত হইতে নিরাশ হইয়াছে। বিড়াল যতক্ষণ কুকুর হইতে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ পায় ততক্ষণ পলায়ন করে, কিন্তু পলায়নের সুযোগ না পাইলে এবং উপায়ন্তর না দেখিয়া বিড়াল কুকুরকে হামলা করিয়া বসে। আবার, যে ব্যক্তির ফাঁসির হুকুম হইয়াছে তাহাকে সকলেই ভয় পায়, না জানি সে আবার কাহাকেও হত্যা করিয়া বসে কিনা। কেননা, সে তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছে এবং চরম নিরাশায় ভূগিতেছে। এ কারণে আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর গজব হইতে নির্ভয় হওয়া উভয়ই কুফুরী। মানুষ গোনাহের কাজ হইতে ঐ সময় মুক্ত হইতে পারে যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহর গজবের ভয় স্থান পায় এবং আল্লাহর রহমতের আশা-ভরসা থাকে। এইহেতু, আল্লাহর রহমতের বর্ণনার পরে جبار জাব্বারীর অর্থাৎ আল্লাহর গজব বা ক্রোধের বর্ণনা আসিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কতক লোক আশা ভরসার উপর নির্ভর করিয়া এবাদত বন্দেগী করে এবং কতক লোক শাস্তির ভয়ে বন্দেগী করে। আল্লাহর রহমতের আশায় যাহারা বন্দেগী করে তাদের জন্যে প্রথম

আয়াত নাযিল হইয়াছে এবং দ্বিতীয় আয়াত হইয়াছে ঐ সমস্ত লোকদের জন্যে যাহারা গজবের ভয় করিয়া বন্দেগী করে। مالك মালিকে ক্বারীগণের মধ্যে এই শব্দে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ ملك মালিকে এবং কেহ ملك মালেকে পাঠ করেন। مالك শব্দের অর্থ বাদশাহ এবং ملك শব্দের অর্থ মালিক। যাহা হউক, এই ملك শব্দ বাহির হইয়াছে مالك শব্দ হইতে এবং শব্দের অর্থ দাঁড়াইয়াছে সম্পর্ক, মজবুত এবং শক্তি বাদশার مالك মালিক এবং - مالك মালিককে ملك মালিক এই জন্য বলা হইয়াছে যে, বাদশার রাজ্য এবং প্রজার সঙ্গে সম্পর্কও থাকে এবং তাহাদের উপর শক্তিও থাকে। আর মজবুত বা দৃঢ়তার সহিত প্রভাববিস্তার করিয়া থাকেন। যাহারা مالك মালিক পড়িয়া থাকেন তাহারা বলেন, বাদশাহর সম্মান সর্বসাধারণ মালিকের চেয়ে অধিক হইয়া থাকে। কাজেই, مالك পড়াই উত্তম, যার অর্থ হয় কিয়ামতের দিনের বাদশাহ। কিন্তু مالك পাঠকারীগণ বলেন যে, ملك পাঠ করা কয়েকটি কারণে উত্তম; প্রথমত مالك মালিকের মধ্যে চারটি হরফ এবং مالك এর মধ্যে তিনটি হরফ এবং কোরআনে কারিমের একটি হরফ পাঠে ১০টি নেকী পাওয়া যায় (১) দ্বিতীয়তঃ বাদশাহ তাহার প্রজাদের হাকিম বা বিচারক।

(১) সুতরাং চারিটি হরফ পাঠে ৪০টি নেকী লাভ হইবে। বাদশাহ তাহার নিজস্ব সম্পদ ও চাকর বাকরদের চেয়ে প্রজার শক্তি বেশি। কেননা, প্রজাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকে যাদেরকে অপারগ অবস্থায় বাদশাহ সাহায্য করিতে হয় এবং সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। তৃতীয়তঃ রায়ত বা প্রজা বাদশার হুকুমত হইতে নিজে নিজে বাহির হইতে পারে।

يَوْمِ الدِّيْنِ ইয়াওমিদ্দীন। অর্থ- কর্মফল বা প্রতিদান লাভের দিন।

يَوْمُ 'ইয়াউম' শব্দের অর্থ আরবী ভাষায় দিনকে বলা হয়। আর দিন হয় সূর্যের পরিবর্তনের ফলে। কিন্তু কিয়ামতের দিন সূর্য্যের পরিবর্তন হইবে না। এই জন্যে এই স্থানে يوم ইয়াওম দ্বারা সময় বা যমানাকে বুঝানো হইয়াছে। তাই, যমানা বা সময় দ্বারা এই অর্থ প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনের সার্বক্ষণিক মালিক বা অধিপতি। কিয়ামত দিবসে যাহা যাহা ঘটিবে, ঐ সমস্ত ঘটনাস মূহের মালিক।

دين দীন শব্দের ২টি অর্থ-(১) প্রতিদান বা বদলা এবং (২) মীমাংসা বা সুবিচার, ঐ হাশরের দিন আল্লাহ পাক বলিবেন لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ 'আজিকার বাদশাহী কাহার'? ঐ সময় হাশরের ময়দান নীরব নিস্তব্ধ অবস্থায় বিরাজমান থাকিবে, কেহই উত্তর দিবে না। অতঃপর আল্লাহ পাক নিজেই উত্তরে বলিবেন

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার।

আড়িয়া সম্প্রদায়ের প্রশ্ন ঃ কোরআন শরীফে এই আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ পাক কেবল কিয়ামত দিবসের মালিক, তবে কি আজ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ মালিক আছে?

উত্তর - এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ ও উত্তম। এই তাফছীরেই উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। দেওবন্দী-ওয়াহাবীদের প্রশ্ন যখন কিয়ামতের দিনের মালিক আল্লাহ পাকই তখন নবীগণ ও অলিগণকে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী মানা তাহাদিগকে ঐ দিনের উপকারী বা সাহায্যকারী মানা এ আয়াতের বিপরীত।

বেদাতী লোকেরা আল্লাহর অলি এবং পীর-বুজুর্গ দিগের নামে নজর মানে যে, তাহারা হাশরের দিন কাজে আসিবেন। এই আকীদা মুশরিকানা আকীদা ।

উত্তর ঃ- শাফায়াত আলেম ও অলিগণের পক্ষে হইবে এবং হওয়াও দরকার। ইহাতে আল্লাহ পাকের মালিক হওয়ার ব্যাপারে কোনও সমস্যা সৃষ্টি হইবার কথা নহে। নবীগণ, অলিগণ এবং আলেমগণ ঐ সংকটময় দিনে শাফায়াত করিবেন সন্দেহ নাই। ইহা দলীল প্রমাণের দ্বারাই স্বীকৃত। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু হাকিকী বা প্রকৃত মালিক। আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালাম, আওলিয়ায়ে এজাম ও উলামায়ে কেরাম আলাইহিমুর রহমাত ওয়ার রেদওয়ান আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা ও প্রতিনিধি। তাঁহাদের কথা আল্লাহ পাক যথারীতি শ্রবণ করিবেন।

আল্লাহ পাকই যদি প্রকৃত মালিক হন, তবে শাফায়াতের কী অর্থ হইতে পারে। আল্লাহ পাক নিজেই ক্ষমা করিয়া দিতেন, তথাপি শাফায়াত বা সুপারিশের বিধান আল্লাহপাকের মনোনীত।

দুনিয়ায় ও প্রত্যেক জিনিসের মালিক আল্লাহ পাক। তবু দুনিয়ায় একজন অন্যজনের সুপারিশ করিয়া থাকেন এবং তাহা কার্যকর হইয়া থাকে।

ইনশাআল্লাহ শাফায়াতের বিস্তারিত আলোচনা আয়াতুলকুরসী-এর তাফছীরে পেশ করিতে মনস্থ করিলাম।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ

ইয়্যাকা না'বুদু

অর্থ ঃ আমরা শুধু তোমারই এবাদত করি।

এই আয়াতের সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে এ আয়াতের কয়েক প্রকার সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রথমতঃ এই রূপে যে, প্রথম হইতে এই পর্যন্ত আল্লাহপাক স্বীয় নিয়ামত এবং জাব্বারী ও অধিকারের বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে, উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ পাকের বান্দাদিগকে আল্লাহর বন্দেগীর দিকে আকৃষ্ট করা। কেননা, সাহায্যের কারণে মানুষ স্বভাবতই গোলামীর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে এবং ভয়-ভীতির কারণেও

মানুষ বন্দেগী করিতে বাধ্য হয়। এইহেতু, ইরশাদ হইয়াছে- اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকানা'বুদু)। তাই, এ পর্যন্ত এবাদতের প্রতি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং পরক্ষণেই এবাদতের স্পষ্ট আদেশ জারী করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে স্বীয় ৫ (পাঁচ) নামের বর্ণনা করিয়াছেন। যথাঃ- (১) আল্লাহ্, (২) রব, (৩) রহমান, (৪) রাহীম এবং (৫) মালিক। যেমন- আল্লাহ পাকের বর্ণনা মোতাবেক। আমি তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছি, তাই আমি তোমাদের আল্লাহ। আমি তোমাদের লালন-পালন করিয়াছি, তাই আমি তোমাদের রব্ (প্রতিপালক)। তোমরা গোনাহ করিয়াছ, আমি তোমাদের ক্ষমা করিয়াছি; তাই আমি তোমাদের প্রতি রহমান। তোমরা তওবা করিয়াছ, আমি কবুল করিয়াছি এবং মার্জনা করিয়াছি; তাই আমি রাহীম। অতঃপর তোমরা আমার কবজায় বা অধীনে রহিয়াছ এবং প্রতিদান পাওয়ার ও শাস্তি লাভের দিনও আসিবে; তাই আমি মালিক বা একচ্ছত্র অধিপতি। তবে, হে বান্দাগণ। তোমরা আমারই এবাদত কর। আর, এবাদত বা উপসনার যোগ্য একমাত্র তিনি যাঁহার মধ্যে ঐ সমস্ত গুণাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই, হে বন্দাগণ। তোমরা একথা বল হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমরই এবাদত (বন্দেগী) করি।

তৃতীয়তঃ এই যে, মানুষের তিনটি অবস্থায় দিন অতিবাহিত হয়-বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত। এই তিনটি কালে বা অবস্থায় মানুষ আল্লাহপাকের মুখাপেক্ষী। কেননা, যখন বর্তমান কাল ছিল না, তখন আল্লাহ্ পাক মেহেরবানী করিয়া বর্তমান কাল সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন উপার্জন করিবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ছিল না। তখন আল্লাহ পাক অনুগ্রহ সহকারে রিযিক (পানাহার) যোগাইয়াছেন। এ বিষয় 'আল্লাহ্' শব্দও রব শব্দের তাফছীরে আলোচনা করা হইয়াছে। আবার বর্তমান অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে তথা সর্ব অবস্থায় মানুষ আল্লাহপাকের মুখাপেক্ষী। ইহার আলোচনা রহমান ও রাহীম-এর বর্ণনায় আলোচিত হইয়াছে। আবার কবরে ও হাশরের ময়দানে মানুষ আল্লাহ পাকেরই মুখাপেক্ষী। ইহারও আলোচনা 'মালিকি ইয়াওমিদ্দিন-এর তাফছীরে বিশদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা এইরূপঃ হে মানব! তোমরা সর্ব অবস্থায় রাব্বুল আলামিন আল্লাহপাকের মুখাপেক্ষী। এক্ষণে, ইরশাদ হইয়াছে যে, যাহার দয়ার সীমা পরিসীমা নাই, যাহার দয়া তোমাদের জন্য সর্বক্ষণ প্রয়োজন এবং যাহার দয়া ও করুণা চিরস্থায়ী তোমরা সেই মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর।

تَفْسِيْر তাফছীর

তাফছীরে আলেমানা এ আয়াতে কারীমা প্রসঙ্গে উলামাগণ বলিয়াছেন-এ আয়াতে কারীমার আলোক-রশ্মি বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত ও প্রতিভাত হইয়াছে।

প্রথমতঃ এই যে, এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জিকির ছিল কেবল তাঁহার নাম সমূহের আর এক্ষণে, স্বয়ং আল্লাহ পাকের প্রতি সম্বোধন করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ এ যাবৎ আল্লাহ তায়ালারই কথা ছিল, এক্ষণে এই আয়াতে বান্দার কথাও বলা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ এ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর আলোচনা ছিল, এখন বান্দার গুণের কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা এইভাবে, اِيَّاكَ **(ইয়্যাকা)** প্রথমে এবং نَعْبُدُ **(না'বুদু)** পরে। اِيَّاكَ **ইয়্যাকা** শব্দকে প্রথম এজন্যে রাখা হইয়াছে যেন ইহাতে কালেমায়ে হাছারের হয়। অর্থাৎ 'আমরা তোমারই বন্দেগী করি।' আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু তদীয় জাত (সত্তা) ও ছিফাত (গুণ) সহকারে ক্বাদীম সর্বদা মওজুদ (চিরঞ্জীব) আর আমরা তথা তামাম মাখলুকাত হাদিছ বা পরে অস্তিত্ব লাভকারী যে মহান সত্তা প্রথমেই বা স্বয়ং-অস্তিত্ববান তাঁহার কথাই সর্বপ্রথম এবং পরে অস্তিত্ব লাভ যারা তাদের কথা পরে। ইহাতে এই শিক্ষাও রহিয়াছে যে, যখন কাহারও নিজের আলোচনা ও আল্লাহপাকের আলোচনা বা স্মরণ করিতে হয় তখন সর্বাগ্রে আল্লাহপাক জাল্লাশানুহুর স্মরণ ও আলোচনা করতঃ শেষে নিজের আলোচনা করিতে হইবে। ইহাতে ঐ বিষয়েরও ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, এবাদত কারীর নিয়ত বিশুদ্ধভাবে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্য হইবে। দুনিয়াকে প্রদর্শন করিবার জন্য নহে। কেননা, যে ব্যক্তি রিয়া বা প্রদর্শন ইচ্ছায় অর্থাৎ লোক দেখানোর নিমিত্ত এবাদত করে সে আল্লাহর আবেদ নহে, বরং সে তারই আবেদ যার প্রদর্শন ইচ্ছায় বা যাকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে এবাদত করে। জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তিকে আমি লক্ষ্য করিয়াছি তিনি যখন নামাজে দন্ডায়মান হইতেন তখন তিনি খুব ক্রন্দন করিতেন। আমি তাঁহাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিতে লাগিলেন, 'আমার জানা নাই যে, আমি সত্য-নামাজী না মিথ্যাবাদী। আমি মুখেতো বলিতেছি اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকা নাবুদু), কিন্তু যদি আমার অন্তরে সামান্য পরিমাণ রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা থাকে তখন আল্লাহ পাকের আদেশ হইবে 'তুমি মিথ্যাবাদী।' ওরে, কমবখত! মসজিদে দাঁড়াইয়া নামাজের হালাতে আমার সম্মুখে হাত বাঁধিয়া আমারই সহিত মিথ্যা বলিতেছ যে, মুখে বলিতেছ اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকা না'বুদু) আমরা তোমারই বন্দেগী করি আর অন্তরে অন্য কাহারও পূজা করিতেছ।' দয়াময় আল্লাহ পাক আমাদিগকে যেন সত্য নামাজী হইবার এবং সঠিকভাবে বন্দেগী করিবার তৌফিক দান করেন, আমীন।

৯৫ ك 'কাফ' খেতাব এইজন্য আনা হইয়াছে যে, বান্দা যেন এই সময় আল্লাহপাককে হাজির ও নাজির ধারনা করে। যেমন-নামাজী ধারনা করিবে, 'আমি আল্লাহকে দেখিতেছি এবং আল্লাহ পাক আমাকে দেখিতেছেন এবং তাই

আমি বলিতেছি إِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকানা'বুদু)- আমরা তোমারই এবাদত করিতেছি। নামাজী নামাজ আরম্ভ করিবার সময় গায়েব (অনুপস্থিত) ছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে আল্লাহপাকের ছিফাত বা গুণাবলী বয়ান করার বদৌলতে এমন ভাবে আল্লাহর দরবারে হাজির হইয়াছে যে, এখন সে আল্লাহ পাককে দেখিতেছে এবং আল্লাহর সঙ্গে কথা বলিতেছে।

এ যাবৎ আল্লাহপাকের গুণাবলীর বর্ণনা করা হইতেছিল, আর এখন সরাসরি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে-হাজিরের ছিগা দ্বারা। গুণের বর্ণনা করা গায়েবের ছিগা দ্বারা উত্তম রীতি এবং প্রার্থনা করা হাজিরের ছিগা দ্বারা উত্তম।

জরুরী জ্ঞাতব্যঃ- নামাজে কাহাকেও খেতাব বা সম্বোধন করিয়া কথা বলা জায়েজ নাই। যদি কেহ এরূপ করিবে তাহার নামাজ হইবে না। তবে, আল্লাহপাক জাল্লা জালালুহু এবং তদীয় মাহবুব হুজুর পোরনূর আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম এর খেতাব ব্যাতীত। তাহা এই যে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ **ইয়্যাকানা'বুদু** এবং আত্তাহিয়্যাত-এ হুজুরে পাককে খেতাব করতঃ বলা হয়- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ **আচ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু**। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, নামাজী যেমন আল্লাহপাককে হাজির-নাজির ধারনা করে; তদ্রুপ, আল্লাহর মাহবুব হুজুর আলাই হিস্‌সালামকে হাজির-নাজির জ্ঞান করে। উপরন্তু, নামাজী আল্লাহপাককে যেমন সন্তুষ্ট করার নিয়ত করে অনুরূপভাবে আল্লাহর হাবীবকেও। এইহেতু, সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রেদওয়ান নামাজের হালাতে হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব রক্ষা করিয়াছেন।

نَعْبُدُ না' বুদু عَبْدٌ আব্দুন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার আভিধানিক অর্থ-আযিযি বা নম্রতা প্রকাশ করা। এই জন্যে সাধারণ রাস্তাকে আরবী ভাষায় ত্বরিকে মুআব্বাদ বলা হয়; কেননা তাহা প্রত্যেকেরই পদতলে পরে।

তাফছীরে কবীর ঃ শরীয়ত অনুযায়ী نَعْبُدُ 'না'বুদু' عِبَادَةٌ এবাদত হইতে গঠিত হইয়াছে। এবাদতের অর্থ আবেদ হওয়া (রুহুল বয়ান) অথবা এই অর্থ যে, 'আমরা তোমারই এবাদত করি।' অর্থাৎ 'তোমারই বন্দেগী করি।' কোরআনে কারীমে عَبْدٌ শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা-মাখলুক, মামলুক, মৃতি ও ফানাফিল্লাহ্। এই জন্যে কালিমায়ে শাহাদাতে রহিয়াছে عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (আব্দুহু ওয়া রাছুলুহু)। এবাদত বহু প্রকারঃ- নামাজ, রোজা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি। বরং জায়েজ কর্মও আল্লাহ পাক-এর রেজামন্দি বা সন্তুষ্টির নিয়তে করিতে হয়। তবে, ইহা আল্লাহর এবাদতে গণ্য হইয়া যায়। এমনকি, মানুষ আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির জন্যে নিজের সন্তানাদিকে লালন-পালন করিয়া থাকে এবং অসহায় এতিম মিসকিন ছেলেমেয়েদেরও নিজের

সন্তানের ন্যায় সেবা-যত্ন ও প্রতিপালন করে। ইহাতে এবাদত ও সাওয়াব উভয়ই রহিয়াছে। نَعْبُدُ 'না'বুদু' এই কালিমায় এই সমস্ত কিছুই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তদ্রূপ, বান্দা হইবার জন্য বহুগুণের দরকার। যথা-আল্লাহপাকের সর্বকাজে ও ইচ্ছায় রাজী বা সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করা, বালা মুছিবত বা বিপদাপদে সবর এখতিয়ার বা ধৈর্য্য ধারণ করা এবং নিজের আকীদাকে বিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর বান্দাগণের সহিত সদ্ব্যবহার করা প্রভৃতি। মোটকথা উল্লিখিত সব কিছুই বর্ণিত কালিমা 'না'বুদু'র মধ্যে শামিল রহিয়াছে। نَعْبُدُ জমা (বা বহুবচনের) ছিগা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে এই বিষয়ের ইঙ্গিত বহন করিতেছে যে নামাজি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিতেছে 'হে পরওয়ারদিগার। আমি তোমার দরবারে শুধু একা হাজির হই নাই; শুধু এবাদতই হাজির করি নাই; বরং তোমার সমস্ত বান্দাগণের সঙ্গে আমি সম্মিলিতভাবে রয়েছি যাহাদের মধ্যে আম্বিয়া, আওলিয়া, শুহাদা এবং সালেহীন তথা তামাম নেক্‌কার বা পূণ্যবান ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। যদি আমি নগণ্য বান্দার এবাদত তোমার শাহী দরবারে কবুল হওয়ার যোগ্য না হয়, তাহা হইলে নবী, অলি এবং শহীদ ও সালেহীনগণের উছিলায় কবুল কর।' ফকীহগণ বলেন-যে ব্যক্তি ভাল মাল ও খারাপ মাল একত্র করিয়া বিক্রয় করে তখন খরিদ্দারের পক্ষে একথা চিন্তা করার সময় থাকে না যে, ভাল মালকে খারাপ মাল হইতে পৃথক করিয়া গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ- খারাপ মাল রাখিয়া ভালটা নিবে। হয়ত ভাল-খারাপ মিলিত অবস্থায় সবই নিবে, অথবা সবই ফেরৎ দিয়া খরিদ না করার বিবেচনা করিবে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ। জানিয়া রাখুন, আমার আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন এমন মেহেরবান ও দয়াবান যে আল্লাহ পাকের বেনজীর-বেমিছাল শাহী দরবার হইতে প্রত্যেকের বন্দেগী ফেরৎ দেওয়া হয় না, সকলের সম্মিলিত বন্দেগী কবুল হওয়ার প্রামান্য দলীলই হইতেছে না'বুদুর জমার ছিগার ব্যবহার-কালামে ইলাহীর এ এক চমৎকার সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য। ইহাতে নেক্‌কার বা পূণ্যবান দিগের ওছিলায় আমরা গোনাহগারদেরও বন্দেগী কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

মাসআলা ঃ مسئله যদি কোন ব্যক্তি একা একা আল্লাহ পাকের এবাদত করে তখনও এই ধারনা করিবে যে, আমার পূর্বে আল্লাহ পাকের বহু বহু প্রিয় বান্দাগণ এই কর্ম করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। আমি আমাকে আল্লাহপাকের সেই পূণ্যবান বান্দাগণের মধ্যে শামিল করিতেছি। যেমন, এক ব্যক্তি সদুদ্দেশ্যে এ ধারণায় নিজের ছেলে-মেয়েদের লালনপালন করে, অথবা চাকুরী করে এবং মনে করে ইহা আল্লাহ পাকেরই আদেশ-পালন কিংবা তাহার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হইতে অর্পিত-দায়িত্বপালন তখন ইহা এবাদতে গণ্য হইবে।

এই সময় এই নিয়ত করিবে যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও নিজের আওলাদ গণের জন্য এই কর্ম করিয়াছেন। আর পূর্ববর্তী নবীগণও করিয়াছেন, আমাদের প্রিয় নবীর সাহাবাগণ করিয়াছেন, আওলিয়াগণ করিয়াছেন। তাঁহারা হালাল উপার্জনের নিমিত্ত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছেন, ক্ষেতে খামারে কাজ করিয়াছে এবং মাঠে-ময়দানে বকরী চড়াইয়াছেন আমি তাঁহাদেরই অনুসরণ করিতেছি। এই হেতু, এ আয়াতে না'বুদু'র মধ্যে জমার ছিগা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় আক্বাও মাওলা সরকারে দো-আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাংসারিক কাজ কর্ম নিজ হাতে করিয়াছেন। এই জন্যে সাংসারিক কাজকর্ম করা আমাদের জন্য নবীজীর সুন্নত পালন হইতেছে। ইহাতে অবহেলাকারীদের পরিনাম অত্যন্ত খারাপ ও ভয়াবহ-সন্দেহ নাই। অনুরূপভাবে, কোন ব্যক্তি যদি একাকী নামাজ পড়ে তখন সেও বলিবে اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকা না'বুদু) অর্থাৎ, 'পরওয়ারদিগার। আমরা কেবল তোমারই এবাদত করি'। কেননা, আল্লাহপাকের হাজার হাজার বান্দাগণ ইহার পূর্বে এই এবাদত একই নিয়মে পালন করিয়াছেন এবং হাজার হাজার বান্দাগণ এখনও করিতেছেন। তাহাদের সহিত হাজার হাজার ফেরেশতাগণ এবাদত করে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, সে ব্যক্তি একাকী এবাদত করিতেছে, কিন্তু হাকিকতে সে শত সহস্রের সঙ্গে শামিল রহিয়াছে। এইজন্যে, সে যদিও এক ব্যক্তিকে সালাম জানায় তবে বলে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ আসসালামু আলাইকুম 'তোমাদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হউক'। কেননা তাহার সঙ্গে ফেরেশতাগণও রহিয়াছেন, সালামের জওয়াবদাতা ও একই নিয়মেই জওয়াব দিয়া থাকেন।

مسئله (মাসআলা) ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, জামাআতে নামাজ আদায় করা আবশ্যক এবং জামাআতে নামাজ পড়া উচিৎ। বরং প্রত্যেক এবাদত মুসলমানদিগের এজতেমা বা সমাবেশের স্থান। জামায়াত ব্যাতীত এবাদত অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

তাফসীরে সুফীয়ানা

সুফীয়ানে কেরামের নিকট উহাই পরিপূর্ণ এবাদত যাহাতে শুধু আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করাই উদ্দেশ্য থাকে। যদি বেহেশত পাওয়ার জন্য এবং দোজখ হইতে বাঁচার জন্য এবাদত করে উহা এক প্রকার বেকুফী। কেননা, বেহেশত দোজখের ফায়সালা কিয়ামতের পরে হইবে, অথচ রেজায়ে ইলাহী বা মাওলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে এবাদত করা হয়, তাহা সঙ্গে সঙ্গেই হাছেল হইয়া যায়। এইহেতু উহা উপকারী এবং এজন্য বলা হইয়াছে اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকা না'বুদু) হে আল্লাহ তোমারই বন্দেগী করি। অর্থাৎ, আমার এবাদত দ্বারা মাকছুদ

একমাত্র তুমি হে আল্লাহ! এ কারণে নামাজের নিয়তে বলা হয় لِلّٰه (লিল্লাহ) আল্লাহর জন্যে; কিন্তু একথা বলা হয় না যে, বেহেশতের জন্য। অথবা দোজখ হইতে মুক্তির জন্য।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বেহেশত লাভের জন্য এবং দোজখ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবাদত করিয়া থাকে সে এবাদতের ফলাফল কিয়ামতের পূর্বে পাইবে না। কেননা, বেহেশত দোজখের ফায়সালা কিয়ামতের পরে হইবে। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় যে এবাদত করে সে ব্যক্তি ইহার মকছুদ অদ্য হইতেই লাভ হইবে। যেহেতু ইহা উপকারে অনুকূল রহিল আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই এবাদতের রুহ বা প্রাণ। ফলতঃ মানুষ ধোকা ও প্রতারণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আনন্দ ও শান্তির প্রতি প্রত্যাবর্তন করিবে। দুনিয়ায় অন্ধকার ও অশান্তি আর দ্বীনের পথেও এবাদতে রহিয়াছে নির্মল শান্তি। কোরআনে কারীমে ইরশাদ হইয়াছে 'হে প্রিয় মাহবুব। আমি অবগত আছি যে, কটুকথায় ও অশোভন আচরণে আপনার অন্তরে কষ্ট অনুভূত হয়; ইহার এলাজ বা চিকিৎসা হইতেছে-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

(ফাছাব্বিহ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াকুম্ মিনাচ্ছাজেদীন ওয়াবুদ্ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতিয়াকাল্ ইয়াক্বীন)। প্রতীয়মান হইল যে, এবাদত দুঃখ কষ্টের চিকিৎসা ও প্রতিষেধক। কাজেই, যে এবাদতে এ মর্মার্থ নাই উহা প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র। যে বিষয়ে আপন প্রিয় মাহবুব সন্তুষ্ট, উহা এবাদত, আর যে কাজে তিনি অসন্তুষ্ট উহা গোনাহতুল্য। হজরত মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু-র জন্য খায়বরের দিন হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিদ্রার আরামের জন্য আসরের নামাজ কোরবান করিয়া (ছাড়িয়া) দেওয়া হাকিকতে এবাদত ছিল। নামাজ ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে যদি মাহবুবে বারী তায়ালার সন্তুষ্টি থাকে তবে নামাজ ছাড়িয়া দেওয়াই স্বয়ং এবাদত। আর নামাজ পাঠের মধ্যে যদি প্রিয় মাহবুবের সন্তুষ্টি থাকে তবে উহা এবাদত কোন সন্দেহ নাই। সূর্য উদয় কালে নামাজপড়া গোনাহের কাজ, কেননা তাহাতে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নারাজ, কাজেই উহাতে এবাদত নাই, বরং গোনাহ।

প্রশ্নমালা

১নং প্রশ্ন ঃ আল্লাহ পাক যখন গণী (পরওয়াহীন) সকল বিষয় হইতে বে-পরওয়া; তখন তাঁহার বন্দেগীর কি প্রয়োজন? তিনি এবাদত বন্দেগীর আদেশ কেন দিলেন? আর আমরাই বা কেন বিনা কারণে কষ্টসহকারে এবাদত করিব?

উত্তরঃ- আল্লাহপাক জাল্লা শানূহু-র আমাদের এবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন কখনও নাই; বরং আমাদের প্রয়োজনেই আমরা আল্লাহর বন্দেগী করি। মূল্যবান আসন বা বিছানায় বসিবার যোগ্য কেবল ঐ ব্যক্তিই হইতে পারে যাহার দেহ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং যাবতীয় অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা মুক্ত। অপবিত্র ও অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি ঐ বিছানা বা আসনে বসিবার যোগ্য নহে। আল্লাহপাকের বেহেশ্‌ত অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র জায়গা। ঐ বেহেশ্‌তের উপযুক্ত কেবল ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাঁহারা সর্ব প্রকার অপবিত্রতা হইতে মুক্ত ও পাক পবিত্র। দুনিয়ার জীবন যাপনে এবং দুনিয়ার প্রতি নিমগ্নতা আমাদের অন্তরকে নাপাক বা অপবিত্র, এবং অপরিচ্ছন্ন বা কলুষ কালিমাযুক্ত করিয়া দেয়। এবাদত আল্লাহর রহমত এর পানি স্বরূপ, এবাদত অন্তরের কালিমা দূর করিবার উপকরণ। যদি এবাদতে উহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র না হয়, তবে অবশেষে হৃদয়ের আয়নাটি একেবারে সম্পূর্ণ কলুষিত ও মূল্যহীন হইয়া যায়। দুষমন কর্তৃক পরিবেষ্টিত পেরেশান মানুষ তখনই কেবল রক্ষাপায় এবং নিরাপদ থাকে, যখন সে নিজস্ব শক্তিতে বলীয়ান হয়। অথবা কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমরা প্রকৃত পক্ষে, দূর্বল এবং সহস্রাধিক শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি। যথাক্রমে, শয়তান ও শয়তানের চেলা-খান্নাছ (মানব ও জীন জাতীয়) এবং নফছে আম্মারা, দুনিয়ার যাবতীয় অপকর্মের প্রভাব এবং অসৎ বন্ধু বান্ধব ও দুষ্ট সংগী-সাথী প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, আমাদের অতিশয় জরুরী প্রয়োজন ও অপরিহার্য কর্তব্য হইল আমাদের পরম করুনাময় আল্লাহপাক রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে অতিশয় নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। আর এ সম্পর্ক কেবল এবাদতের দ্বারাই স্থাপিত হইয়া থাকে। বিদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তি মাত্রই দেশ তথা দেশবাসীর কথা শ্রবণে শান্তিলাভ করে এবং আনন্দিত হয়। আত্মা বা রুহের জন্য দুনিয়া হইতেছে বিদেশ, জান্নাত বা বেহেশত হইতেছে রুহের জন্য স্বদেশ এবং দুনিয়ার জিন্দেগী আত্মার জন্য প্রবাস-জীবন। সুতরাং এবাদতের দ্বারা আত্মার স্বদেশের কথা আসল বাসস্থানের কথা স্মরণ হয়। এই জন্যে তাহাতে শান্তিলাভ হয়। তাফসীরে আজিজীতে বর্ণিত আছে- হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে জোবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর দেহের কোন অঙ্গে একটি জখম ছিল যাহার ফলে ঐ অঙ্গটি কাটিবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অত্যন্ত ব্যথা ও কষ্টের কারণে উহা কাটা সম্ভবপর ছিল না। যখন তিনি নামাজে দাঁড়াইয়াছেন তখন উহা কাটিয়া ফেলা হয় এবং ইহাতে তাঁহার সামান্যতম কষ্টও অনুভূত হয় নাই।

আড়িয়াদের প্রশ্ন-

মুসলমানেরা বলে যে, 'আমরা আল্লাহর-ই এবাদত (বন্দেগী)করি এবং

আমরা মুয়াহহেদ বিল্লাহ; অথচ তাহারা কাবার দিকে মাথা নত করে তাহারা হিন্দুদের চেয়েও বড় মুশরীক। কেননা, হিন্দুরা এক পাথরের পূজা করে; আর মুসলমানেরা হাজার হাজার পাথরের তৈরী ইমারতকে। যদি মুসলমান বলে, 'আমরা কা'বা কে খোদা বলিয়া স্বীকার করি না তবে হিন্দুরাও বলিবে, আমরা মূর্ত্তিকে খোদা বলিয়া ধারনা করি না। আমরা কেবল নিজের ধ্যানকে এক দিকে নিয়োজিত ও নিমগ্ন রাখার উদ্দেশ্যে এক পাথরকে সামনে রাখিয়া থাকি।

উত্তর ঃ- প্রিয় পাঠকবৃন্দ গভীর মনযোগ সহকারে অনুধাবন করুন। ইহার উত্তর নামাজের নিয়তের মধ্যে রহিয়াছে। কেননা, নিয়তের মধ্যে স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে, 'নামাজ শুধু আল্লাহ পাকের জন্যেই। মুখ কা'বা শরীফের দিকে থাকায় প্রমাণিত হইল যে, নামাজ কাবার জন্য নহে। নামাজতো কেবল আল্লাহপাকের জন্যে। কেবল দিক নির্নয়ের জন্যে কা'বার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতে হয়। যদি নামাজ কা'বার জন্য হইত, তবে যেদিকে কা'বার পাথর, মুসলমান সেদিকে সেজদা করিত। কিন্তু কার্যতঃ ইহা নহে। কা'বা শরীফের গিলাফ আমাদের নিকট আসে, কিন্তু আমরা উহাকে সেজদা করি না। যদি ঐ জায়গার কোনও পাথর বরং সমস্ত ইমারত বাংলাদেশে রাখা যায় তবু কেহ বাংলাদেশের দিকে ফিরিয়া সেজদা করিবে না। হিন্দুদের অবস্থা ইহার বিপরীত যে দিকে তাহাদের মূর্তি, সেই দিকেই তাহারা মাথানত করে। ইহা জানা গেল যে, তাদের মাথা শুধু মূর্ত্তির জন্যই নত করে। আর মুসলমানদের মাথা একমাত্র আল্লাহপাকের জন্যই অবনত করিয়া থাকে। বরং খওফ বা ভয় ভীতি অবস্থায় ছফরের সময় নফল নামাজ যেই দিকে মুখ করিয়া পড়িবে, নামাজ হইয়া যাইবে। فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ফাআইনা মা তুয়াল্লু-ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ)। অর্থাৎ, তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহ পাক এর অস্তিত্ব বিরাজমান, আবার পার্থক্য এই যে, হিন্দু সম্প্রদায় পাথরের মূর্ত্তি কোন কোন মানুষের নামে বানাইয়া থাকে। যথা- রাম চন্দ্র, মা-কালী, দেব, মহাদেব প্রভৃতির নামে। ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে খোদার শরীক এবং খোদায়ী ক্ষমতার অংশীদার হিসেবে স্বীকার করা হয়। আর এই হেন ভ্রান্ত ধারনাও অলীক কল্পনায় উহারা ঐ সমস্ত পাথরের মূর্ত্তি সামনে রাখিয়া মাথানত করিয়া থাকে, যেন উহারা ইহাদেরই এবাদত করে। পক্ষান্তরে, কাবা শরীফের বেলায় এমন কোন ভ্রান্ত ধারনা ও বিশ্বাস নাই। আর ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে, কাবা ইমারতের নাম নহে বরং স্থানের নাম। ঐ স্থানে যদি ইমারত নাও থাকে তবু ঐ দিকে ফিরিয়া নামাজ পরিতে হইবে। এই ইমারত ঐ জায়গার নিশান। যখন পর্বতের উপরে এবং ভূগর্ভস্থ কক্ষে নামাজ পড়া হয় তখন ঐ ইমারতের কোন অংশই সামনে থাকে

না। নামাজে ঐ স্থানের দিকেই মুখ ফিরাইতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আড়িয়াদের এবাদত বিশুদ্ধ বলিয়া মানিয়া নেওয়া উচিত; কেননা উহারা কোন মূর্তি পূজা করে না, আল্লাহর নামই জপ করিয়া থাকে। তোমরাও আল্লাহর নাম লইয়া থাক। উদ্দেশ্যতো আল্লাহর নামই স্মরণ করা, যে যে ভাবে পারে স্মরণ করে বা করবে।

উত্তর ঃ বিশুদ্ধ অর্থে এবাদত উহাই যাহা হক ছোবহানাহু তায়ালার পক্ষ হইতে নবী রাসুলগণের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নিজের আকলের দ্বারা মনগড়া এবাদত-এবাদত নহে। মুসলমান যে এবাদত করে তাহা আল্লাহ পাকের নির্দেশিত এবং নবী রাসুল আলাইহিমুস সালামগণের শিক্ষার মাধ্যমে। এই এবাদত অতিশয় বিশুদ্ধ, আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়। আর ভ্রান্ত বিশ্বাসী আড়িয়াদের এবাদত বলিয়া কথিত যাহা তাদের নিজ বুদ্ধি বিবেচনায় তাহা কল্পিত ও গঠিত। কাজেই, উহারা যাহাই করুক না কেন ভ্রান্ত ধারনা ও নিজস্ব মনগড়া দোষে দুষ্ট ও পরিত্যাজ্য। অতএব, আল্লাহ পাকের আনুগত্য সহকারে আল্লাহর বিধি বিধানের পাবন্দী একান্ত আবশ্যক।

দেওবন্দী-ওয়াহাবীদের প্রশ্ন

দেওবন্দী ওয়াহাবী ফেরকার নিকট এবাদত ঐ কাজকে বলা হয় যাহা আল্লাহপাক নিজের জন্য খাছ করিয়াছেন এবং ইহা বান্দার বন্দেগীর নিশান বানাইয়াছেন। মৌঃ ইসমাঈল রচিত তাকবিয়াতুল ঈমান দ্রষ্টব্য। এই হেতু, এ সমস্ত কাজ গায়রে খোদা অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য করা বা মানা শিরক ও ভুত পরস্তী তুল্য। এই জন্যে দেওবন্দী মজহাব অনুযায়ী কাহাকেও ডাকা বা আহ্বান করা, কাহারও নামের দোহাই দেওয়া, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া, কাহারও ঘর কিংবা জংগলের আদাব বা সম্মান করা কাহারও স্মৃতি স্মরণ করা, কাহারও কবরকে ঝাড়ু দেওয়া কিংবা সম্মান করা, কাহারও প্রতি নিজের কাম অথবা নিজের নামে নিছবত বা সম্পর্ক স্থাপন করা; অর্থাৎ, আলী বখ্‌শ, নবী বখ্‌শ নাম রাখা; মোটকথা, কাহাকেও কোন প্রকার তাজিম সম্মান করা দেওবন্দী ধর্ম মতে, গায়রুল্লাহর এবাদত এবং শিরক এবং إِيَّاكَ نَعْبُدُ। **ইয়্যাকা না'বুদুর পরিপন্থী। তাদের উক্তি হইল আমরা খোদার বান্দা এবং ওয়াদা ও করিয়াছি যে, আমরা তোমারই এবাদত করিব। কাজেই, খোদাকে ছাড়িয়া কোন বান্দার সহিত এই মামেলা করা নিশ্চয়ই শিরক।**

উত্তর ঃ- যদি দেওবন্দীদের ধর্মগুরু ইসমাঈল-এর ধর্ম মত অনুযায়ী এবাদতের এ তারিফ বা সংজ্ঞা তর্কের সূত্রে মানিয়াও লওয়া যায়, তথাপি, যে সমস্ত বিষয়কে

ওয়াহাবীরা শিরক্ আখ্যা দিয়েছে তাহা শিরক্ হয় না, হইতে পারে না। আর এ ভ্রান্ত আকীদা অনুসারে দুনিয়ায় কেহই শিরক্ হইতে বাঁচিতে পারিবে না। কোন মুসলমানতো নহেই; বরং দেওবন্দী ওয়াহাবী মোল্লাও নহে। প্রথমতঃ এই জন্যে যে, কবরে ঝাড়ু দেওয়া, কাহাকেও ডাকা, কাহারও নিকট সাহায্য চাওয়া কাহারও স্মরণীয় দিন পালন করা আল্লাহপাকের জন্য খাছ নহে বরং এইগুলো বন্দেগীর নিশানও নহে। সাহায্যের পর্যালোচনা আল্লাহর ফজলে পরবর্তীতে اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ইয়্যাকা নাস্তাঈন) এর তাফছীরে উল্লেখ করা হইবে। এখন অন্যান্য বিষয়সমূহ কিছু কিছু আলোচনা করিতেছি; গভীর মনযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

(১) কাউকে ডাকা বা আহ্বান করা আল্লাহর জন্য খাছ নহে। স্বয়ং আল্লাহ পাক নবীগণকে ডাকিয়াছেন। يَاَيُّهَا النَّبِيُّ **ইয়া আইয়্যুহান্নাবীয়্যু** হে নবী! يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ **ইয়া আইয়্যুহার রাছুলু** হে রাসুল, এবং মুসলমান দিগকে **'ইয়া আইয়্যুহাল্লাজিনা আমানু,** হে ঈমানদারগণ। এ সম্বোধনে এবং কাফেরদেরকেও **'ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন'** হে কাফের সকল! এবং আহলে কিতাবকে ডাকিয়াছেন- **ইয়া আহলাল্ কিতাব,** হে কিতাব অনুসারীবৃন্দ এবং মানবজাতিকে ডাকিয়াছেন- **ইয়া আইয়্যুহান্নাছু** হে মানবজাতি! এবং আল্লাহপাক মরদুদ শয়তানকে ডাকিয়াছেন- ইয়া **ইব্লিছু,** হে ইবলিছ বলিয়া এবং আল্লাহ পাক পাহাড় পর্বতকে ডাকিয়াছেন। এই অবস্থায় আল্লাহপাক রাব্বুল ইযযাত মাআজাল্লাহ প্রথম মুশরিক এবং শিরক এর তালিমদাতাও বটে, নাউজুবিল্লাহ। অপরদিকে, কোরআন পাঠ করাও শিরক। আমাদের প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাসাল্লাম উম্মতদিগকে ডাকিয়াছেন। হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু, হজরত ছারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকিয়া ছিলেন। যিনি নাহাওয়ান্দে যুদ্ধরত ছিলেন। অথচ হজরত উমর ফারুক ঐ মুহূর্তে মদীনায় মসজিদে নববী শরীফে খুতবা পাঠরত ছিলেন। আর আমরা দিন রাত একে অপরকে বারংবার ডাকাডাকি করিতেছি। এ দিকে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং মৌঃ কাসেম নানাতুবী তার কাসিদায় হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত আলাইহিস সালামকে আহ্বান করিয়াছেন- مدد کرائے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار

বাঃ কি চমৎকার! দেওবন্দীদের ধর্মগুরু কেমন আযিযি ও বিনম্রবচনে আল্লাহর রাসুল সারোয়ারে কায়েনাতের নিকট মদদ (সাহায্য) প্রার্থনা করিয়াছেন। সারকথা এই যে, কাহাকেও আহ্বান করা বা ডাকা কে শিরক বলিয়া উক্তি করা অদ্ভুত ধরনের বেয়াকুবী বা অজ্ঞতা ও নিরেট মূর্খতা।

(২) **কাহারও স্মৃতি স্মরণঃ** কোন ব্যক্তি বা বস্তুর স্মৃতি চারণ বা স্মৃতি স্মরণ আল্লাহ

পাকের জন্য খাছ নহে। কেননা, আল্লাহ পাক কাহাকেও বা কোন কিছুকে স্মরণীয় বা স্মৃতি স্বরূপ বানান নাই। বরং আল্লাহর বান্দাগণই তাহা বানাইয়াছেন। হজ্জ সম্পূর্ণ স্মৃতি চারণ। হজ্জ-এর দ্বারা হাজেরা রাদিয়াল্লাহ আনহার স্মৃতি স্মরণ। তাহা না হইলে দৌড়ান ও লম্ফান, পাথর নিক্ষেপ করা মূলতঃ পূণ্যের কাজ ছিল না। পাঞ্জেগানা (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাজ ও বিভিন্ন নবী আলহিসসাল্লাম গণের স্মৃতি বহন করিতেছে। কাজেই, সন্দেহাতীত রূপে একথা বলা যায় যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে নবী আলাইহিমুস সালামের স্মৃতি স্মরণ করা হয়। যেহেতু, নবীগণ বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানে যত রাকাত নামাজ আদায় করিয়াছেন, ইসলাম তাহাই কায়েম রাখিয়াছে। এই জন্যে একেক ওয়াক্তে একেক নামাজের রাকাতও বিভিন্ন। যথাক্রমে, ফজরে ২ (দুই) রাকত, জোহরে ৪ (চার) রাকাত, আছরে ৪ (চার) রাকাত, মাগরিব ৩ (তিন) রাকাত ও এশার ৪ (চার) রাকাত ফরজ। আবার বিতরের নামাজ ৩ (তিন) রাকাত ওয়াজিব ইত্যাদি। সোমবার দিন রোজা রাখা এই জন্যে সুন্নত যে, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শুভাগমনের দিবসকে স্মরণার্থে। যদি স্মরণীয় দিনকে পালন করা শিরক হয় তবে ওয়াহাবী মোল্লারাই বলুন, এ জাতীয় শিরক হইতে কে রক্ষা পাইবে?

(৩) **কবরে ঝাড়ু দেওয়া ঃ** এ কাজটিও আল্লাহ পাকের সহিত খাছ নহে। আল্লাহ পাক মাআজআল্লাহ কাহারও কবরে ঝাড়ু দেন নাই এবং আল্লাহ পাকেরও কবর নাই যে, লোকজন আল্লাহর কবরে ঝাড়ু দিবে। আবার ঝাড়ু দেওয়ার কাজটি মোটেও বন্দেগী নহে। যদি ঝাড়ু দেওয়া বন্দেগী হইত তবে প্রত্যেক দেওবন্দী-মোল্লার বগলে একটি করিয়া ঝাড়ু সর্বদা আবশ্যকীয় ভাবে শোভা পাইতো। কেননা ইহা বন্দেগীর নিশান হিসাবে অবশ্যই সঙ্গে রাখার কথা।

(৪) **দিন-তারিখ নির্ধারিত করা ঃ** নির্দ্দিষ্ট দিন বা তারিখ ধার্য্য করা মোটেও শিরক নহে। কেননা হজ্জের দিন নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। নামাজের জন্য ওয়াক্ত নির্ধারিত আছে। রোজার জন্য রমযান মাস নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। দুই ঈদের দিন নির্দ্দিষ্ট। জুমার নামাজের জন্য শুক্রবার নির্ধারিত। বিবাহ-শাদীর জন্য তারিখ ধার্য্য করিতে হয়। দেওবন্দীদের মাদ্রাসা সমূহের সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং পরীক্ষার তারিখ অবশ্যই নির্ধারিত করিতে হয়। এমনকি, তাদের মাদ্রাসার সালানা জলছা বা বাৎসরিক সভারও তারিখ ধার্য্য করিতে হয়। এখন বল, তোমাদের মনগড়া ফতোয়া তোমাদের মুখেই থুথু হইয়া পড়িল কি না। এতসব শিরক হইতে তোমরা কিভাবে নিষ্কৃতি পাইবে? নিজেদের ফতোয়ায় নিজেরাই মুশরিক হইলে। সাবধান। সময় থাকিতে এখনও তওবা করতঃ মুসলমান হও।

(৫) **আবদুন্নবী** নাম রাখাও শিরক নহে। কারণ, এই স্থানে, আব্দ এর অর্থ আবেদ নহে গোলাম বা আনুগত্য স্বীকারকারী। কোরআনে কারীম ইরশাদ করেন-

তোমার বান্দা। যেহেতু, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক আদেশ দিয়াছেন قُلْ يَا عِبَادِى (কোল ইয়া ইবাদী) অর্থ্যাৎ, হে প্রিয় নবী! আপনি বলুন, হে আমার বান্দা বা গোলামবৃন্দ।

দু'রো মোখতার কিতাবের লেখকের পীরের নাম ছিল আবদুন্নবী, যদি عبد النبى নাম রাখা শিরক হয় তবে এই শিরক হইতে কে রক্ষা পাইয়াছে?

(৬) **আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের ওয়াছিলা মানা ঃ** আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম এবং আওলিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুর রাহমাত ওয়ার্ রেদ্ওয়ানের ওয়াছিলা মানা কখনও শিরক্ নহে এবং তাহাদিগকে নিজেদের উপকারী, সহায়তাকারী রূপে জ্ঞান করাও শির্ক্ নহে। দেওবন্দী ওয়াহাবী মোল্লাদের ইহা এক প্রকার ধোকা ও প্রতারণা মাত্র। ফেরেশতাগণ হজরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সেজদা করিয়াছেন। হজরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে তাহার ভ্রাতাগণ সেজদা করিয়াছেন এবং তাহারা সকলেই আল্লাহ পাককেও সেজদা করিতেন। এখন বলুন, ইহাতে পার্থক্য কি ছিল? আসলে, আল্লাহ পাকের সেজদা এবাদতের ছিল এবং আদম আলাইহিস্ সালামও ইউসুফ আলাইহিস্সালামের প্রতি সেজদা ছিল তাজিমী সেজদা অর্থাৎ, আল্লাহর নবীর প্রতি তাজিম ও সম্মান প্রদর্শন। পার্থক্য শুধু নিয়তের মধ্যে ছিল। সেজদাকারীগণ আল্লাহকে সেজদা করিত খালেক বা স্রষ্টা জানিয়া এবং বুজুর্গ ব্যক্তিকে সেজদা করিত বুজুর্গ জানিয়া।

لطيفه **একটি সুক্ষ্ম কথাঃ** জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি ইবনে মাসউদ নজদীর যুগে মদীনা পাকে হাজির হইলেন। মদীনা মুনাব্বারায় রওজা শরীফের সামনে তিনি হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন নজদী পুলিশ বলিল কিহে! তুমি কি নামাজ পড়িতেছ? তুমিতো মুশরিক হইয়া গেলে। তখন সেই বুজুর্গ ব্যক্তি উত্তর দিলেন কিভাবে? পুলিশ বলিল, কাহারও সামনে নামাজের ন্যায় দাঁড়ান অর্থাৎ হাত বাঁধিয়া দাঁড়ান তাহারই এবাদত। কাজেই, ইহা শিরক। বুজুর্গ বলিলেন, তবে কিরূপে দাঁড়াইতে হইবে। পুলিশ উত্তর দেয় 'হাত ছাড়িয়া।' তখন বুজুর্গ বলিলেন, 'হাত ছাড়িয়া দাঁড়ানো মালেকী মজহাবের নামাজ।' যদি নাভীর নীচে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াই তবে হানাফী মজহাবের নামাজ, নাভীর উপরে হাত বাঁধিলে শাফেয়ী মজহাবের নামাজের সাদৃশ্য হইয়া যায় তবে বল, 'দাঁড়াইবার উপায় কি? এইবার পুলিশ বেচারা নীরব হইয়া গেল। তখন বুজুর্গ ব্যক্তি বলিলেন-ওহে শোন, কোন কাজ কর্ম এবাদত হওয়া না হওয়া নিয়তের উপর নির্ভর করে।

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ **ওয়া ইয়্যাকা নাছ্তাঈন**

অর্থ ঃ এবং আমরা কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

আয়াতের সম্পর্ক ঃ- পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত এ আয়াতের কয়েক প্রকার সম্পর্ক রহিয়াছে।

প্রথমত ঃ এই যে, সুরায়ে ফাতেহার মধ্যে কয়েকটি বিষয় রহিয়াছে। যথা - (১) আল্লাহ পাকের প্রশংসা, (২) নিজের বন্দেগীর প্রকাশ, (৩) এ সুরার মাধ্যমে দোয়া বা প্রার্থনা করা, ইতিপূর্বে দুই দুইটি বিষয় অতীত হইয়াছে, এখন তৃতীয়টি শুরু হইতেছে। কিন্তু দোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় হইল ওয়াছিলা, কোন ওয়াছিলায় দোয়া বা আরজী পেশ করা কিংবা ওয়াছিলায় উহা মঞ্জুর হওয়ার আশা পোষণ করা যায়। এই জন্যে, ইহার পূর্বে এবাদতের কথা আসিয়াছে এবং পরে দোয়ার কথা। অর্থাৎ, আমরা তোমার এবাদত করি এবং এবাদতের ওয়াছিলায় তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই (তাফসীরে আজিজি)। এই কারণে, বালা-মুছিবতের সময় নামাজ ও সদকা আদায় করিয়া কিংবা অপরাপর নেক আমল করিয়া দোয়া করা হয়; যেন নেক আমলের ওয়াছিলায় দোয়া কবুল হয়।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক দোয়াতে হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াছিলা প্রয়োজন। কেননা, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজিরী (উপস্থিতি) ও আল্লাহ পাকের এবাদত। আর একথা সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক এবাদতই দোয়ার ওয়াছিলা। এই হেতু, আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন-

وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ (ওয়াবতাগু-ইলাইহিল্ ওয়াছিলাহ্)

দ্বিতীয়ত ঃ ইতিঃপূর্বে, বলা হইয়াছিল, 'হে আল্লাহ' আমরা শুধু তোমারই এবাদত করি। আর, এখন বলা হইতেছে, 'হে আল্লাহ! আমরা এবাদতকে পরিপূর্ণ করার জন্য কেবল তোমারই সাহায্য চাই।' অর্থাৎ, এবাদত শুরু করা আমাদের কাজ এবং উহা পরিপূর্ণ করা তোমার দায়িত্ব।

তৃতীয়তঃ এবাদতের জন্যে কিছু বাহ্যিক শর্ত রহিয়াছে যাহা ব্যতীত এবাদত আদায় হয় না। যেমন- নামাজের অজু শর্ত। আর নামাজের জন্য কিছু বাতেনী (অভ্যন্তরীন) শর্তও রহিয়াছে যাহা ব্যতীত নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। যেমন- খুশু-খুজু, আযিযি-ইনকেছারী অর্থাৎ, দীলের একাগ্রতা ও বিনয়-নম্রতা। উপরন্তু, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা ও তাকাব্বুরী বা অহংকার হইতে অন্তরকে পবিত্র রাখা। যাহার অভাবে নামাজ কবুল হয় না। প্রথম প্রকার শর্ত অজু করা জাহেরী অবস্থায় যাহা বান্দার ইচ্ছাধীন, আর দ্বিতীয় প্রকার শর্ত সমূহের ব্যাপারে মানুষ একেবারে অক্ষম ও অপারগ। কেননা, উহা অন্তরের বাতেনী গুনাবলী যাহা অনায়াসে হাছিল হয়না। তাই অন্তরের সহিত হাজির হওয়া এবং পাক পবিত্র থাকা প্রায় মানবীয় শক্তির বাহিরে। এই হেতু, প্রথমেই বলা হইয়াছে।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ (ইয়্যাকা না'বুদু)-অর্থাৎ, হে পরওয়ার দেগার জাহেরী শর্ত

পালন করিয়া তোমার এবাদত আদায় করি। আর দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী বলা হইয়াছে-

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ওয়া নাছতাঈন)-অর্থাৎ, হে প্রভু! জাহেরী বাতেনী সমস্ত শর্ত পালন করিয়া আমরা তোমারই এবাদত করি তোমার হেফাজত ও তওফীক কামনা করি।

চতুর্থত ঃ নিজের এবাদত এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং এক্ষণে বলা হইতেছে যে, এই এবাদতে মঙ্গল বা কল্যাণের সহিত পৌঁছা এবং এবাদত কবুল হওয়া একমাত্র আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। কারণ, বহু এবাদত রহিয়াছে যে, তাহা সম্পন্ন করা হইলেও সম্পূর্ণই বরবাদ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ পাক যদি হেফাজত করেন তবে প্রার্থনা এই যে, 'হে প্রভু! আমরা তোমার এবাদত করিয়াছি তারপর ইহার হেফাজতের জন্য তোমার সাহায্য কামনা করি।'

পঞ্চমত ঃ এবাদতে বাঁধা প্রদানকারী যাহা, উহা হইল নফছে শয়তান, দুনিয়ার কাজকর্ম এবং খারাপ বন্ধু-বান্ধবদিগের সংশ্রব। আর এবাদতকারীকে সহায়তাকারী রুহ, ঈমান এবং কোরআন। এবাদতকারীকে এবাদত সম্পন্ন করিবার সময়-২(দুই)টি লস্করের মোকাবেলা করিতে হয়। যথাক্রমে, রহমানী লস্কর ও শয়তানী লস্কর। এইহেতু, আরজ করা হইয়াছে 'হে প্রভু! তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। অর্থাৎ, এবাদত রূপ এই জেহাদে শয়তানী লস্কর বা সেনাদলের উপর রহমানী লস্কর বা সেনাদলকে জয়যুক্ত করিয়া দাও।' এবাদতকারীর জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবার মর্ম ইহাই।

তাফছীরে আলেমানা ঃ تفسير عالمانه

উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এই স্থানে সাহায্য প্রার্থনার দ্বারা বুঝায় কেবল এবাদতের মধ্যে সাহায্য প্রার্থনা করা কিংবা দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কাজ কর্মে সাহায্য প্রার্থনা করা। দ্বিতীয় অর্থ অধিকতর উত্তম। ইহাতে যেন একথা বলা হইতেছে 'হে আল্লাহ! আমরা যেমন তোমার এবাদত করি, তদ্রুপ, কেবল তোমারই নিকট সমস্ত কাজ কর্মে সাহায্য কামনা করি।' আর আমরা অবশ্যই মুশরিক নহি যে, কতক কাজকর্মে তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব এবং কতক কাজ কর্মে তুমি ব্যাতীত অন্যের কাছে সাহায্য চাহিব। প্রত্যেক কাজ কর্মে কেবল তোমারই উপর ভরসা স্থাপন করি এবং তোমার সাহায্যই প্রকৃত সাহায্য। ইহাতে আল্লাহর বান্দাদের জন্য শিক্ষার বিষয় এই যে, সর্বদা আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি নজর রাখা, আল্লাহর স্মরণ ও শোকর আদায় করা এবং আল্লাহর সাহায্যই প্রকৃত সাহায্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। যদি কোনও সময় আল্লাহর বান্দার পক্ষ

হইতেও কোন প্রকার সাহায্য চাইতে হয়, তথাপি মনে ধারনা রাখিবে ইহাও আল্লাহ পাকের নিকট কামনা করি। উহা এই দৃষ্টিকোন হইতে যে, সবকিছুই আল্লাহ পাকের আজীমুশ্বান শাহী দরবারের খাদেম স্বরূপ। সাহায্য মূলতঃ আল্লাহর পক্ষ হইতেই, খাদেমদিগের খেদমতের আঞ্জাম কেবল উপলক্ষ্য বা মাধ্যম রূপে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিদ্যুতের দ্বারা শত কাজ হইতেছে। যথা-আলো দেওয়া, পাখা চালান, গাড়ীর ইঞ্জিন তথা যাবতীয় কল-কারখানার ইঞ্জিন চালনা করা ইত্যাদি কাজ বৈদ্যুতিক তারের নহে বরং পাওয়ার হাউজে তাহা সম্পন্ন হইতেছে। কাজেই আল্লাহর বান্দাদিগের মধ্যে যে সাহায্য করে তাহার মধ্যে যদি সাহায্য করার ক্ষমতা না থাকিত অথবা আল্লাহর অনুগ্রহ না থাকিত তবে সে কখনও আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিত না। এই শক্তি ও অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ হইতে। অতএব, প্রকৃত সাহায্যকারী নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহু।

আল্লাহপাক ব্যতীত অন্য কাহারও উপর ভরসা স্থাপন করা গুরুতর অপরাধ।

تفسير صوفيانه তাফসীরে সুফীয়ানা

সুফীয়ানে কেরাম বলেন যে, একটি দরজা আমাদের জন্য এমনও রহিয়াছে যেথায় পৌছিয়া মানুষ বাহ্যিক বস্তু সমূহের উপর মোটেও নজর রাখে না; বরং কতক জায়গায় আল্লাহ পাকের নিকটও নিজের যবান দ্বারা নিজ অবস্থার কথা নিবেদন করেন না। যেমন-হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম যখন নমরুদের অগ্নিকুন্ডে ছিলেন তখন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আরজ করেন, 'আপনার কিছু দরকার হইলে আমাকে বলেন।' হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বলেন, 'তোমার কাছে কিছুই নাই।' তখন জিবরাঈল বলেন, 'আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন।' হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম বলিলেন- حسبى من سوالى علمه بحالى

অর্থাৎ, তিনি নিজেই অবগত এবং তাঁহার অবগতি-ই আমার জন্যে যথেষ্ট, (হে জিবরাঈল) তোমার বলার কী প্রয়োজন। سبحان الله ছোবহানাল্লাহ! ইহা সেই অবস্থা যে অবস্থায় উপনীত হইয়া আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ প্রার্থনা করা হইতেও বিরত থাকেন। এক্ষণে ঐ দিকে ইশারা করা যাইতেছে- وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা তোমারই নিকট সাহায্য কামনা করি। জানিয়া রাখুন, আওলিয়ায়ে কেরামের এ অবস্থা সর্বদা হয় না।

যখন পরীক্ষার সময় হয় তখন দোয়া করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর রাজী থাকা উভয়ই এবাদত। এই জন্যে হজরত ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য কেহ দোয়া করেন নাই যে, 'হে আল্লাহ! কারবালার মছিবত হইতে ইমাম

হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে রক্ষা কর।' আর যখন বন্দেগী প্রকাশ করিবার সময় হয় তখন সব কিছুই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। কেননা, বান্দার কাজ শুধু প্রার্থনাই করা।

তাফছীরে কবীর ও তাফছীরে রুহুল বয়ান শরীফে এই স্থানে উল্লিখিত আছে যে, হজরত ইবরাহীম খলীল আলাইহিস্সালাম যখন اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ইয়্যাকা নাস্তাইন-এর উপর আমল করিলেন তখন নমরুদের অগ্নিকুণ্ড ফুল বাগানে পরিণত হইয়া যায়। মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত আল্লাহ্ পাকের মহা অনুগ্রহ ইহা। **প্রিয় পাঠক**। জানিয়া রাখুন, মুসলমান যখন নিজের মধ্যে এহেন উন্নত হাল বা অবস্থার উদয় করিতে সমর্থ হইবে তখন দোজখের অগ্নিও তাহার কিছুই করিতে পারিবে না। বরং মুমিন-বান্দা যখন পুলছিরাত অতিক্রম করিবে তখন দোজখ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবে, 'হে মুমিন, তোমার ঈমানের নূর আমাকে নির্বাপিত করিয়া দিতেছে, তুমি শীঘ্র চলিয়া যাও।' হাদিস শরীফে আছে- এক সময় বেহেশতী মুসলমান গোনাহগার মুসলমানদিগকে দোজখ হইতে মুক্তি দিবার জন্য দোজখে যাইবে, তাহাদের উপর তখন দোজখের আজাব কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না এবং তাহারাও দোজখের আজাব অনুভব করিবেন না।

দেওবন্দী-ওয়াহাবীদের আপত্তি   دیوبندیوں کا اعتراض

যখন তোমরা (সুন্নীগণ) কোরআন পাঠ কালে আল্লাহ্ পাকের নিকট এই ওয়াদা কর যে, হে প্রভু, তোমারই নিকট সাহায্য চাই', তখন নবীগণ ও অলিগণের নিকট কেমন করিয়া সাহায্য চাও? ইহা কি শিরক নহে?

উত্তর ঃ আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালাম এবং আওলিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুর রাহমাত ওয়ার রেদওয়ানের কাছে সাহায্য চাওয়া হাকীকতে আল্লাহ্ পাকের নিকট চাওয়া। আল্লাহ পাকের সাহায্য দুই প্রকার ঃ- (১) বিল ওয়াছেতা (মাধ্যম সহকারে) এবং (২) বেলা ওয়াছেতা (মাধ্যম ব্যাতীত)। আল্লাহর খাছ বান্দাগণের সাহায্য আল্লাহ পাকের ফয়জে রাব্বানীর ওয়াছেতা বা মাধ্যম স্বরূপ। কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক অন্যের সাহায্যের ব্যাপারে কিংবা মাধ্যম সহকারে সাহায্য প্রার্থনা করিতে মুমিনবান্দাদিগকে আদেশ করিয়াছেন

(ইস্তায়িনু বিচ্ছাব্রি ওয়াচ্ছালাহ্) ,اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ

হে মুমিনগণ! ধৈর্য্য এবং নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।

এক্ষণে, লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল ছবর বা ধৈর্য্য এবং সালাত বা নামাজ কোনটাই খোদা নহে। কোরআনে পাকে আরও এরশাদ হইয়াছে-

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর ধর্মের সাহায্য করিবে তবে আল্লাহ ও তোমাদিগকে

সাহায্য করিবেন।

চিন্তার বিষয়, আল্লাহ পাক জাল্লাশানুহু এতবড় গণী (ধনী) হইয়া বান্দার নিকট সাহায্যের আদেশ করেন। তবে আমরা গরীব হইয়া আল্লাহ পাকের মুখাপেক্ষী হইয়া যদি কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি তাহাতে দোষের কী হইতে পারে।

হজরত জুল কারনাঈন বলেন- اَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ

(আয়িনুনী বিকুয়্যাতিন) অর্থাৎ, তোমরা আমায় নিজ শক্তি দ্বারা সাহায্য কর।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলিয়াছেন- مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰه

(মান আনছারী ইলাল্লাহ্)

অর্থাৎ, আল্লাহর দীনের পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে?

আল্লাহ পাক অন্যত্র ইরশাদ করেন- وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰا

(ওয়া তাআওয়ানু আলাল্ বির্রে ওয়াত্ তাক্ওয়া)-অর্থাৎ তোমরা পারস্পরে পরস্পরকে পূণ্য কাজে এবং তাকওয়া বা পরহেজগারীতে সহায়তা কর। ফলকথা, কোরআনে কারীমে বিভিন্ন জায়গায় অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে আদেশ জারী করিয়াছেন কিংবা উৎসাহিত করিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের বাণীর উপর যথার্থরূপে আমল করিয়াছেন। উপরন্তু সাহাবায়ে কেরামের এক জামাতের নাম ছিল আনসারী। যার শাব্দিক অর্থই হইতেছে সাহায্যকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চাইলে যদি শিরক্ হয় তবে বর্ণিত নামই মুশরিকানা। অথচ সাহাবায়ে কেরাম (মদীনাবাসী) জামাতের নাম আনসার রাখিয়াছেন স্বয়ং আল্লাহপাক ও রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরতের পর মদীনায় শুভাগমণ করিয়া মদীনাবাসী সাহাবায়ে কেরামের এ জামাতের উপাধী ঘোষণা - আনসার এবং কোরআনে কারিমেও আল্লাহ পাক তাহাদিগকে আনসার বলিয়া স্বীকৃতি দিলেন। হজরত ঈসা আলাইহিস্সালামের উম্মতদিগকে আল্লাহ পাক কোরআনে নাছারা বলিয়াছেন। ইহার অর্থও সাহায্যকারী। যদি এই বিষয়ে হাদিস এবং ফেকা শাস্ত্রের দালায়েল সমূহ একত্র সন্নিবেশিত করা যায় তবে উহা বিরাট একটি কিতাব হইয়া যাইবে। কাজেই, সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। দেওবন্দী মোল্লাগণ মাদ্রাসার নামে বিভিন্ন ফসলের মওসুমে মওসুমী চাঁদা কালেক্শান করিতে বাহির হইয়া মানুষের কাছেই যায় এবং ধনীদের জাকাত-ফিতরার জন্য ধর্ণা দিয়া থাকে। এখন নিজেদের ফতোয়ায় তাহারা নিজেরা মুশরিক হইল কিনা? আরও জিজ্ঞাস্য যে, দেওবন্দী মোল্লাগণ কোন কোন সময় থানায় পুলিশের কাছে এবং কোর্টে কাচারিতে হাকীমের নিকট শরনাপন্ন হইয়া আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করে কিনা? জিজ্ঞাসা করি-তখন কি পুলিশ আর হাকীম ঐ মোল্লাদের খোদা হইয়া

যায়? বস্তুতঃ মানুষের জন্ম হইতে শুরু করিয়া মৃত্যু এবং কবর পর্যন্ত কেবল মানুষেরই সাহায্যের প্রয়োজন জন্মের সময় ধাত্রীর সাহায্য, জন্মের পর মাতা-পিতার সাহায্য, রোগ-পীড়ার সময় ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য; এবং মালদার বা সম্পদশালীদের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহের উপায় এবং উস্তাদ ও পীর মাশায়েখগণের সাহায্যে ঈমান ও নেক আমল পাইয়া থাকে। অতঃপর, জিন্দেগীর শেষ মুহূর্তে নিজের বংশের লোক তথা আপনজনের তালকীন অনুযায়ী ঈমানের কালেমা নসীব হয় এবং মৃত্যুর পর মুসলমানের গোসল, কাফন এবং দাফন-কার্য্য সমাপন হয়। আবার মুসলমানদের সাহায্যের বদৌলতে ছোয়াব-রেছানী করা হয়। ইহার পরও কেহ বলিতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্য চাওয়া বা নেওয়া শিরক? আফসুস। তাদের গলত-ফাহমী বা অজ্ঞতার জন্য।

প্রিয় পাঠক! জানিয়া রাখুন, কোরআন-হাদীস বুঝিবার জন্য ঈমানী নূরের প্রয়োজন। ঈমানী নূরের অভাবে সঠিক জ্ঞান ও বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটিয়া থাকে।

দেওবন্দী-মোল্লাদের ২নং আপত্তিঃ- জিন্দা-ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য চাওয়া জায়েজ বটে, কিন্তু মুর্দ্দা-ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য চাওয়া সম্পূর্ণই শিরক্।

উত্তর ঃ- এ আয়াতে কারিমায় বিষয় বস্তুর বিশ্লেষণে জিন্দা-মুর্দ্দার কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। যেমন- اِيَّاكَ نَعْبُدُ ইয়্যাকা না'বুদু-র মধ্যে এবাদত আল্লাহপাকের জন্য খাছ করা হইয়াছে। এখানে এবাদতের ক্ষেত্রে জিন্দা-মুর্দ্দার কোন প্রশ্ন নাই। অনুরূপভাবে, وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈন-এর মধ্যেও জিন্দা বা মুর্দ্দার কোনও তারতম্য নাই।

সাহায্য দুই প্রকার ঃ (১) শরীর বা দেহের দ্বারা (বাহ্যিক) দৈহিক সাহায্য এবং (২) রুহ বা আত্মার দ্বারা রুহানী (আধ্যাত্মিক) সাহায্য। যেমন-বাহ্যিক সাহায্যের ব্যাপারে কাহাকে এ কথা বলা যে, 'আমাকে পানি পান করাও, কিংবা আমাকে রুটী তৈয়ার করিয়া দাও।' আর রুহানী সাহায্য পাইতে আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তির নিকট হাজির হইয়া কোনও জটিল সমস্যার সমাধান কামনা করা, যাহা বাহ্যিক সাহায্যের দ্বারা অসম্ভব। আল্লাহ ওয়ালাগণের রুহানী সাহায্যের বদৌলতে নিঃসন্তান লোকের সন্তান লাভ, কঠিন মুছিবত হইতে উদ্ধার হওয়া এবং দোজখ-মুক্তি ও বেহেশত লাভ এই ধরনের আধ্যাত্মিক সাহায্যের প্রমাণ, প্রকৃত পক্ষে, সাহায্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতেই আসে, আল্লাহওয়ালাগণ ওয়াছিলা মাত্র। যেমন-সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হইতে কেহ কেহ হুজুর সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিতেন- 'ত্বাহহিরনী ইয়া রাছুলাল্লাহ'-'হে আল্লাহর হাবীব আমাকে পবিত্র করুন, আমার দ্বারা মস্ত বড় গোনাহের কাজ প্রকাশ হইয়াছে।' হুজুরে পাক তাহাকে পবিত্র করিতেন, ব্যবস্থা দিতেন। কেহ আরজ করিতেন-ইয়া রাছুলাল্লাহ। আমাকে দোজখ হইতে রক্ষা

করুন, আল্লাহর সঙ্গে মিলাইয়া দিন।' এই সমস্ত রুহানী সাহায্য।
মৃত্যুর পর কোন কোন মানুষের দৈহিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, কিন্তু রুহানী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি কবরে অবস্থান করিয়া দুনিয়ার সমস্ত অবস্থা দেখিতে পারে এবং ছোট আওয়াজও শুনিতে পারে। তখন রুহ্ রুহানী জিন্দেগীতে থাকিয়া রুহানী সাহায্য করিতে পারে। মৃত্যুর পর আবার রুহানী সাহায্য অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দেখুন, মে'রাজের রাত্রিতে হজরত মুসা আলাইহিস্সালাম মুসলমানদিগকে ৫০ (পঞ্চাশ) ওয়াক্ত নামাজের পরিবর্তে ৫ (পাঁচ) ওয়াক্ত মঞ্জুর করিবার ব্যাপারে মস্ত বড় রুহানী সাহায্য করিয়াছেন। এ আধ্যাত্মিক সাহায্য হজরত মুসা আলাইহিস্সালাম তাহার পরলোক গমনের প্রায় তিন হাজার বৎসর পরে করিয়াছিলেন। আর, এখনও আমাদের প্রাণ প্রিয় আক্বা ও মাওলা হুজুর সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের বরকতে বহু কাফের মুশরিক মুসলমান হইয়া ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।
হজরত মুসা আলাইহিস্সালাম এবং হজরত হারুন আলাইহিস্ সালামের তাবারুকের সাহায্যে বনি ইসরাঈল যুদ্ধে জয়লাভ করিত। এই প্রসঙ্গে আল্লাহপাক কোরআনে পাকে ইরশাদ ফরমান- اَنْ يَّاتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ (بقره)
হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরলোক গমনের পর সাহাবায়ে কেরাম হুজুরে পাকের পোষাক মুবারক এবং চুল মুবারক ধৌত করতঃ পান করিতেন রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে। ইহাতে হুজুরে পাকের (বাতেনী) সাহায্যে রোগ হইতে আরোগ্য হইত। হুজুরে পাক সাহেবে লাওলাক আলাইহিস্ সালামের বাতেনী বা আধ্যাত্মিক সাহায্যের বিবরণ সন্নিবেশিত পৃথকভাবে একটি বড় কিতাব হইয়া যায়। কাজেই এ স্থানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে।

আড়িয়া সম্প্রদায়ের প্রশ্ন

এই আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, কোরআন আল্লাহর কিতাব নহে, কোন এক বান্দার কিতাব। আল্লাহর কিতাব **এ আয়াত মর্মে প্রশ্ন উঠে, আল্লাহ কাহার এবাদত করেন এবং সাহায্যই কাহার নিকট চান?**

উত্তর ঃ- ইহার বিস্তারিত উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে, মূর্খ ও পথভ্রষ্ট আড়িয়াদের অবগতির জন্যে কিছু আলোচনা করিতেছি। কালামে ইলাহীর বাচন ভঙ্গি ও প্রকাশের উত্তম রীতিতে কোথাও কোথাও قُلْ একটি শব্দ উহ্য থাকে। এই স্থানে উহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সুতরাং যাহা উহ্য রহিয়াছে সে قُلْ ক্বোল শব্দ দ্বারা মর্মগ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, আল্লাহপাক বলেন

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা বল, 'হে প্রভু! আমরা কেবল তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।' অতএব, কোরআনে কারীম নিঃসন্দেহে আল্লাহর বাণী; সন্দেহকারী কাফের ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

ইহ্‌দিনাছছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর।

আয়াতের সম্পর্কঃ পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত এ আয়াতের কতিপয় সম্পর্ক রহিয়াছে।

১নং সম্পর্ক প্রথম কথা ছিল যে, 'হে প্রভু! আমরা কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।' কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ ছিল না যে, সাহায্য ঐ বিষয়ে প্রার্থনা করা হইতেছে। এক্ষণে তাহা জানা গেল যে সাহায্য কোন ধরনের। সুতরাং সাহায্যের কিছুটা ব্যাখ্যা করা যাইতেছে যে, 'হে আল্লাহ। আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি যে, আমাদিগকে সহজ সরল রাস্তায় চালিত কর।' ইহাতে পরিনাম ফল নির্ণয় হইয়া গেল যে, দ্বীন-দুনিয়ার সমস্ত কাজ-কর্মে আল্লাহপাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা বাঞ্ছনীয় এবং আল্লাহপাকের সাহায্য বা আল্লাহর নিকট যাবতীয় কাজ-কর্মের তৌফিক কামনা সমস্ত পূণ্যকর্মের মূল।

২নং সম্পর্কঃ প্রথমতঃ আলোচনা ছিল এবাদতের, আর এখন বলা হইতেছে দোয়া বা প্রার্থনা সম্পর্কে। ইহাতে, ঐ দিকে ইশারা হইতেছে যে, এবাদতের পরক্ষনেই দোয়া করা উচিত এবং ইহা সুন্নত। সুতরাং নামাজের পরপরই দোয়া করা সুন্নাত।

৩নং সম্পর্কঃ এই যে, এখন পর্যন্ত কথা ছিল যে, হে আল্লাহ! আমরা তোমার এবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য কামনা করি। আর এখন বলা হইতেছে যে, 'হে আল্লাহ! আমাদিগকে সহজ সরল পথে কায়েম রাখ অর্থাৎ, তোমার এবাদতে আমাদিগকে কায়েম রাখ-দৃঢ়তার সহিত প্রতিষ্ঠিত রাখ, এমন যেন হয়না যে, কিছুদিন এবাদত করার পর তোমার এবাদতের রাস্তা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি, বরং সর্বদা আমাদিগকে তোমার এবাদতে মশগুল রাখ, ইহাই সহজ-সরল পূণ্য পথ।

৪নং সম্পর্ক ঃ এই যে, এতক্ষণ পর্যন্ত এবাদতের প্রসংগই ছিল, এক্ষণে বলা হইতেছে যে, 'হে প্রভু! ঐ এবাদতে সহজ-সরল রাস্তায় কায়েম রাখ, অর্থাৎ ঐ নিয়মে এবাদত সম্পন্ন করার তৌফিক দাও যাহা অবশ্যই কবুল হয়। আর যেভাবে তোমার প্রিয়বান্দাগণ এবাদত করিয়াছেন। আর কাজকর্ম ও সুখ শান্তিতে বিভোর হইয়া যেন তোমার এবাদতে গাফেল হইয়া না পড়ি।

৫নং সম্পর্ক ঃ এবাদতের পর দোয়ায়ে হেদায়াত বা হেদায়াতের প্রার্থনা করা

উচিৎ। কেননা, হেদায়াত ব্যতীত এবাদত মকছুদ পর্যন্ত পৌছায় না। যেহেতু, বড় বড় আবেদ অবশেষে জিন্দিক ও মরদুদ হইয়া পড়িয়াছে। যেমন-ইবলিছ, বরছিছা এবং বল আম ইবনে বাউরা ইত্যাদি। ইহারা প্রথমতঃ মস্তবড় আবেদ ছিল এবং পরে পথভ্রষ্ট হইয়াছে। তাই ইরশাদ হইয়াছে হে আল্লাহ! আমরা ঐ এবাদত চাই যাহাতে রহিয়াছে হেদায়াত বা পথ নির্দেশ এবং হেদায়াতের উপর আমাদিগকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ।

تفسير عالمنه তাফসীরে আলেমানা-

আলেমগণের মূলনীতি অনুযায়ী উক্ত ৪টি বিষয়ে পর্যালোচনা রহিয়াছে।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ইহ্‌দিনা ছিরাত্বাল মুস্তাক্বীম্

ইহ্‌দি শব্দটি هدايت হেদায়াত হইতে গঠিত হইয়াছে যাহার অর্থ পথ প্রদর্শন করা। অথবা মনজিলে মকছুদে বা গন্তব্যস্থলে পৌছিবার নিদর্শন প্রদর্শন করা। হেদায়াত দুই প্রকারঃ (১) শুধুমাত্র রাস্তা দেখাইয়া দেওয়া এবং (২) মনজিলে মকছুদ পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া। যদি রাস্তা দেখানই বুঝাইত তবে হেদায়াতের পর الى ইলা, অথবা لام আনা হইত। অথচ এইস্থানে, এই দুইটি অব্যয়ের একটিও হয় নাই। যাহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, বান্দা আরজ করিতেছে, হে আল্লাহ! আমাদিগকে শুধু সহজ-সরল রাস্তা প্রদর্শনই করিওনা, বরং আমাদিগকে মনজিলে মকছুদ পর্যন্ত পৌছাইয়া দাও। কেননা, রাস্তায় বহু ডাকাত রহিয়াছে এবং তোমার সাহায্য ব্যতীত ঐ রাস্তায় চলা সম্ভবপর নহে। نا না-র দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রার্থনাকারী সকলের জন্যই প্রার্থনা করিতেছেন। একথা বলেনা যে, আমাকে হেদায়াত দান কর; বরং আমাদের সকলকে পথ প্রদর্শন কর। এই বহু বচনের শব্দে কতিপয় উপকারিতা রহিয়াছে। যথা ঃ (১) ঐ এবাদত বেশী পরিমাণে কবুল হয় যাহা মুসলমানদের জামায়াতের অনুষ্ঠিত করা যায়। যাহা সকলের জন্য (মঙ্গল কামনায়) পালন করা হয়। কেননা, একজনের এবাদত কবুল হইলে একজনের ওয়াছিলায় সকলেই এবাদত কবুল হওয়ার আশা করা যায়।

এইহেতু, দোয়ার আগেও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা উচিৎ। কেননা, দরূদ শরীফ নিঃসন্দেহে কবুল হইয়া থাকে এবং রহমতে ইলাহীর বদৌলতে আশা করা যায় যে, মধ্যবর্তী দোয়া কবুল হইবে আগে ও পরে দরূদ শরীফের বরকতে (তাফছীরে কবীর)। (২) এক ব্যক্তি হেদায়াত লাভ করিয়াছে এবং বাকী সবাই পথভ্রষ্ট রহিয়াছে; এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির জীবন-যাপন অতিশয় কঠিন ব্যাপার। কেননা, এক ব্যক্তি যদি সকলের মতের সহিত মিল রাখিয়া চলে তবে সেও পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। আর যদি সকলের সহিত বিরোধীতা করে তবে সকলেই তাহার দুষমন

হইয়া যাইবে। কাজেই, একাকী অবস্থায় জীবনযাপন বড়ই সংকটাপন্ন ব্যাপার। অতএব, হেদায়াত যেন সকলেরই জন্য কাম্য হয় এবং জিন্দেগী সকলেরই যেন মঙ্গলময় হয়। (তাফছীরে আজিজী)। (৩) এই জন্যেই যে, হাদিস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা গোনাহ হইতে পবিত্র মুখে দোওয়া করিও। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ। গোনাহ মুক্ত যবান কোথায় পাইব। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন তোমরা একজন অন্য জনের জন্য দোওয়া করিও; তুমি নিজের জন্য গোনাহ্গার বটে, কিন্তু অন্যের জন্যে নহে (তাফছীরে কবীর)। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, দোওয়া কবুল হওয়ার রহস্য ইহাই যে, সকলের জন্য দোয়া করা। যদি তোমার দোওয়া কবুল হউক, ইহা কামনা কর, তবে আল্লাহর দরবারে সকলেরই জন্য দোওয়া প্রার্থনা করিবে। নিজরে সহিত সকলেরই জন্য দোওয়া করিবে এবং বলিবে, 'হে আল্লাহ! এই দোওয়া কবুল কর।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! জানিয়া রাখুন, কাফেরদের জন্যে ঈমান হইল হেদায়াত। মুমিনের জন্য হেদায়াত হইল তাক্বওয়া এবং মুত্তাক্বীর জন্য তাক্বওয়ার পূর্ণতা অর্জন। আর মুকাররিব বান্দাগণের জন্যে হেদায়াত হইল পরিপূর্ণভাবে কুররাতে ইলাহী (আল্লাহর নৈকট্য) লাভ করা। কাজেই, কাফের যদি এই আয়াত পাঠ করে, ঈমান লাভের দোয়া পাইবে। গোনাহগার যদি পাঠ করে, তবে তাক্বওয়া লাভ হইবে। আর মুত্তাকীর জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের দোয়া।

হেদায়াত ঃ কিন্তু, এ আয়াতের মর্মে কখনও একথা বলা যায় না যে, (মাআজাল্লাহ মিন জালিক) নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গোনাহগার ছিলেন তাহা না হইলে হুজুরে পাক এ আয়াত কেন পাঠ করিতেন? দেখুন, কর্মকার মরিচাযুক্ত ময়লাপূর্ণ লোহাকে পরিস্কার করতঃ পরিস্কার লোহা দ্বারা মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈয়ার করিয়া থাকে। আর স্বর্ণের দ্বারা মূল্যবান অলংকার তৈয়ার করিয়া আশেক তাহার মাশুকের সান্নিধ্যে গমণ করিয়া থাকে। অতএব, আল্লাহর মাহবুব সরকারে কায়েনাতের উক্ত আয়াত তেলাওয়াত সম্পর্কে এ রূপক ব্যাখ্যাই বুঝিতে হইবে। উপরন্তু, হুজুরে পাক ছিলেন উম্মতের জন্য মুয়াল্লিম স্বরূপ।

الصراط (আচ্ছিরাত) صراط (ছিরাত) صرط (ছারতুন) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যার অর্থ গালাইয়া লওয়া যেন রাস্তা মুসাফীরের জন্য সহজ হয়। এই জায়গায় صراط ছিরাত এই জন্যে বলা হইয়াছে যেন পুলছেরাতের কথা স্মরণ হয় এবং এই উদ্দেশ্য হয় যে, 'হে আল্লাহ! আমাদিগকে ঐ রাস্তায় চালাও, যে রাস্তায় চলিলে পুলছেরাত সহজে পার হইতে পারি। اَلْمُسْتَقِيْمُ (আল মুস্তাক্বীম) বাহির হইয়াছে 'ইস্তেক্বামাত' হইতে যার

অর্থ সোজা হওয়া। আর সোজা রাস্তা উহাই যাহা দ্বারা জলদি জলদি গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া যাওয়া সম্ভব হয়। আর ঐ রাস্তায় চলাচলকারীর কোন প্রকার কষ্ট অনুভূত হয় না। আর বাঁকা রাস্তায়তো গন্তব্যস্থানে পৌছা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। কুফুরী হইতেছে বক্র রাস্তা যাহাতে কোনও সময় মনজিলে মকছুদে পৌছিতে পারে না। আর পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় যাহা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এর বিপরীত জামায়াত; তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা কুফুরী পর্যন্ত পৌছে নাই; যথা- রাফেজী ওয়াহাবীদের মধ্য হইতে যাহারা বেয়াদবী করে নাই যদিও তাহারা ক্ষমা পাইয়া শেষ পর্যন্ত বেহেশতে যাইবে, কিন্তু বহু দুঃখ কষ্টের পর। এই জায়গায় এই উভয় রাস্তা হইতে দোওয়া করা হইয়াছে যে, 'হে আল্লাহ! আমাদিগকে সোজা রাস্তায় চালাও। এক্ষণে, প্রশ্ন হইতেছে যে, সোজা রাস্তা কোনটি? সোজা রাস্তায়তো বহু কিছু রহিয়াছে। যথা ঃ- ধর্মীয় ও মজহাবী আকীদা, মুয়ামেলাত, এবং এবাদত প্রভৃতিতে মতপার্থক্য তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী ভিন্ন ভিন্ন, এবং এসব কিছুই শামিল রহিয়াছে। অতএব, এই স্থানে উদ্দেশ্য এই হইবে যে, 'হে আল্লাহ! আমাদিগকে আক্বায়েদ ও আমলের মধ্যে সোজা রাস্তায় কায়েম রাখ। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক বিষয়ে তিনটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। যথা ঃ- (১) **ইফরাত**, (২) **তাফরিত** এবং (৩) **দরমিয়ানী**। (১) **ইফরাত**- অর্থ চরম আদর্শবাদ যাহাতে অতি বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সীমা অতিক্রম করা।

(২) **তাফরীত**- অর্থ চরম শিথিলতা প্রদর্শন। যাহাতে শরীয়তবিধি-বিধানের ক্ষেত্রে শিথিলতা ও অবহেলায় পশ্চাতে অবস্থান করা।

(৩) **দরমিয়ানী**- অবস্থা-অর্থাৎ মধ্যম পন্থা যাহা ইফরাত বা চরম আদর্শবাদ এবং তাফরিত বা চরম শিথিলতাবাদ হইতে মধ্যবর্তী অবস্থা। অর্থাৎ সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন ও অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন। আর এ মধ্যম পন্থারই নাম হইতেছে ছিরাতুল মুস্তাক্বীম। সমস্ত দ্বীন হইতে দ্বীন ইসলাম সহজ-সরলও সোজা রাস্তা। এইজন্য দ্বীন ইসলাম صراط مستقيم ছিরাতে মুস্তাক্বীম, মধ্যবর্তী পথ, ইফরাত-তাফরিত হইতে মুক্ত সহজ-সরল ও সোজা রাস্তা। এই জন্যে যে, দ্বীনে মুসাভী বা মুসা আলাইহিস সালামের ধর্মে বহু কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল। মালের এক চতুর্থাংশ যাকাত ফরজ ছিল। নাপাক কাপড় এবং নাপাক চামড়া কাটিয়া এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। মসজিদ ব্যতীত কোথায়ও নামাজ হইত না। শক্ত শাস্তির পরে তওবা কবুল হইত। হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালামের ঈসায়ী ধর্ম অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, শরাব ও শুকর হালাল ছিল। পবিত্র দ্বীন ইসলাম শুরু হইতেই না ছিল অতিশক্ত বিধান এবং না ছিল অতি নরম পন্থা, বরং শত শত সহজ-সরল বিধানের মাধ্যমে পবিত্র দ্বীনে মোহাম্মাদী প্রতিষ্ঠিত হয়। মালের ৪০ ভাগের ১ অংশ যাকাৎ ফরজ হয়। যে কোন জায়গায়

মসজিদ এবং মসজিদ ব্যতীত সব জায়গায় নামাজ আদায় করা যাইবে। যতবড় গোনাহই হউক, তওবার দ্বারা মাফ হইয়া যায়, নাপাক বস্তুকে পাক করিবার জন্য ৩০ বা ৩২টি অতিসহজ ব্যবস্থা রহিয়াছে। কাপড়কে পবিত্র পানিতে ধৌত করিলেই পাক হইয়া যায়। তামা এবং শিসার বরতন বা পাত্রকে মাজিয়া-ঘষিয়াই পাক করা যায়। নাপাক দুধ এবং তৈলকে পবিত্র জিনিসের সঙ্গে মিশাইলে পবিত্র হইয়া যায়। যদি পানি না পাওয়া যায় তবে তাইয়াম্মুম করিলেই পাক হইতে পারা যায়। শরাব এবং শুকর উভয়েই জ্ঞান-বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়, এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, লজ্জা-শরমকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। এই জন্যে হারাম করা হইয়াছে।

مذهبى عقائد **মজহাবী আকায়েদ ঃ** ধর্মীয় বিশ্বাস মজহাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতকে صراط مستقيم ছিরাতে মুস্তাক্কীম বা সহজ-সরল-সোজা বলা হয়। কেননা ফেরকায়ে জাবারিয়া মানুষকে জড় পদার্থ পাথরের ন্যায় অক্ষম ধারনা করিয়া থাকে এবং ফেরকায়ে কাদারিয়া মানুষকে সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান বলিয়া মানে। এ দুই ফেরকায় রহিয়াছে ইফরাত ও তাফরিত। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এতদুভয়ে মধ্যবর্তী ধারণা অবলম্বনকারী, চরম সীমায় অবস্থানকারী নহে। আহলে সুন্নাতের মতে, মানুষ সৃষ্ট, অক্ষমও বটে, এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বন করিতে ও উপার্জন করিতে সক্ষমও বটে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা ইন্‌শাআল্লাহ্ তকদীরের মাসআলায় উল্লেখ করিব। রাফেজীরা সাহাবায়ে কেরামের দুষমন এবং খারেজী সম্প্রদায় আহলে বাইতে এজামের দুষমন। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ উভয় বাতিল ফেরকার বিপরীত ও বিপক্ষে অবস্থানকারী। কেননা, আহ্‌লে বাইতে কেরাম উম্মতের জন্য জাহাজ স্বরূপ এবং সাহাবায়ে কেরাম নক্ষত্র তুল্য কুতুবনুমা। খারেজী সম্প্রদায় হজরত নূহ আলাইহিস সালামের কিশতী তুল্য আহলে বাইতের জাহাজ হইতে দূরে রহিয়াছে আর রাফেজী সম্প্রদায় নক্ষত্রতুল্য সাহাবায়ে কেরামের দিক নির্দ্দেশনা ছাড়িয়া দিয়াছে। কাজেই, এ উভয় ফেরকার নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, ভরা ডুবি বা সর্বনাশ ডাকিয়া লইয়াছে। আহলে সুন্নাতের নৌকা নির্বিঘ্নে গন্তব্য স্থলে পৌছিয়াছে। অপরদিকে, চকড়ালুভী নামক কুখ্যাত দল হাদিস ও ফেকাহ বর্জন করিয়া নিজে আহলে কোরআন বা কোরআনপন্থী হইবার দাবী করিয়া গোমরাহীর অতল তলে নিমজ্জিত হইয়াছে। নজদী-ওয়াহাবীদের অনুকরণে দেওবন্দী-ওয়াহাবী সম্প্রদায় আম্বিয়া ও আওলিয়াগণকে ছাড়িয়া দিয়াছে; বরং আল্লাহ ও রাসুলের মোকাবেলা করিয়াছে। নাউজুবিল্লাহ মিন জালিকা। দেওবন্দী মুরব্বীরা আল্লাহ পাককে মিথ্যাবাদী সাব্যস্থ করিয়াছে। আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মূর্খ এবং তাদের মত সাধারণ

মানুষ বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। উত্তম ও ছওয়াবের কাজ সমূহকে হারাম ও বেদআত বলিয়া থাকে। ইহারা গোমরাহীকে হেদায়াত ধারনা করিয়া জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামের রাস্তা অবলম্বন করিয়াছে। পক্ষান্তরে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত আল্লাহ ও রাসুলের পথের পথিক। তাই এই রাস্তা সহজ সরল পূণ্য পথ বলিয়া সাব্যস্থ হইয়াছে আল্লাহপাক যেন আমাদিগকে এহেন সহজ-সরল পথে কায়েম রাখেন, আমীন।

আমলসমূহে ঐ আমল ছিরাতে মুস্তাক্বীম যাহা ইসলাম এবং ক্বোরআনে পাকের শিক্ষা অনুযায়ী হইবে। এক ব্যক্তি খুব বেশী নামাজ বা অতিরিক্ত বন্দেগী করে; কিন্তু নিজের জ্ঞাতী গোষ্ঠী ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি হইতে দূরে অবস্থান করে। অপর ব্যক্তি দুনিয়ার ধান্দা ও ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হইয়া আল্লাহর স্মরণ হইতে দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে। এ উভয়ের কেহই সরল সোজা রাস্তায় নাই। তৃতীয় ব্যক্তি আল্লাহপাককে স্মরণ করে, সকলের হক আদায় করে এবং ঝগড়া-ফাসাদ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার চেষ্টা করে। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে সহজ-সরল পথের পথিক। এই বিষয়টি-ই হাদিস শরীফে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে 'তোমরা মুবারক রাত্রি বা শুভ-রাত্রি সমূহে এবাদত কর ও রোজা রাখ এবং ইফতারও কর। তোমাদের চক্ষুরও হক তোমাদের উপর রহিয়াছে, তোমাদের বিবিদের হক তোমাদের উপর রহিয়াছে। এমনকি তোমাদের মেহমানদেরও হক তোমাদের উপর রহিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহপাক স্বীয় কালামে ইলাহীতে ঘোষণা করেন-

وكذالك جَعَلْنكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا (ওয়া কাজালিকা জাআলনাকুম উম্মাতাঁও ওয়াছাতান)

অর্থ ঃ- এবং এরূপে হে মুসলিম জাতি! তোমাদিগকে মধ্যবর্তী উম্মত রূপে সৃষ্টি করিয়াছি। তোমাদের চরিত্র যেন উত্তম হয়, যাহা হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার ছিল। কখনও তোমরা কাহারও উপর রাগ-গোশ্বা প্রদর্শন করিও না, রাগের বশবর্তি হইয়া অশ্লীল ও অশ্রাব্য গালা-গালি করিও না। আর কখনও নিজেকে বড় মনে করিও না। সর্বদা রাগ-গোশ্বায় থাকা কুচরিত্র ও অভাব-অনটনের লক্ষণ।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ। জানিয়া রাখুন, আল্লাহ রাসুলের দুষমন হইতে দূরে থাকা, ধর্মের দুষমণ হইতে দূরে থাকা ইহাই আল্লাহর রাসুল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র এবং ইহা সন্দেহাতীতরূপেই সহজ-সরল রাস্তা। যদি এই সুরায়ে ফাতেহার পূরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে হয় তবে বিরাট গ্রন্থে পরিণত হইবে। কাজেই, সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিলাম।

সুফীয়ানে কেরামের তাফসীর ঃ হেদায়াত কয়েক প্রকার (১) হেদায়াতে ইলহামী যাহা কাহারও নির্দেশ ব্যতিরেকে নিজে নিজে প্রাপ্ত হয়। যেমন-শিশু সন্তানদের জন্য স্তনের দুধ পান করা এবং কান্নাকাটির মাধ্যমে ভাব প্রকাশ এবং নিজের মাকে কাছে ডাকিয়া নেওয়া। (২) অনুভব শক্তি ঠিক হওয়ার পর লাভ করা যায়। যেমন-শিশু সন্তান জ্ঞান লাভের পর ভাল মন্দ বুঝিতে বা পার্থক্য করিতে পারে। (৩) হেদায়াত ঃ যাহা আকলের সাহায্যে পাওয়া যায়, ইহাকে হেদায়াতে নজরী বলা হয়। ইহা দলীলের দ্বারা জানা যায়। অর্থাৎ- মানুষ তার জ্ঞানের দ্বারা দলীলাদি কায়েম করে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহা দ্বারা ফলাফল নিরূপন করে। ৪ নং হেদায়াত ঃ আল্লাহপাকের খাছ মেহেরবাণীতে প্রাপ্ত হয়। ঐ বিষয় কেহই আকল বা জ্ঞান ও দলীল দ্বারা জানিতে পারে না। এই রাস্তা প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসুল আলাইহিমুস্ সালামকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। ইহাও আবার দুই প্রকারঃ-(১) হেদায়াতে আম্মা বা সাধারণ পথ নির্দেশ এবং (২) হেদায়াতে খাছ্ছা বা বিশেষ পথ-নির্দেশ। হেদায়াতে আম্মা বা সাধারণ হেদায়াত যাহা আহকামে শরীয়তের মাধ্যমে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে সমস্ত সৃষ্টিকুল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন-আকায়েদে ইসলামিয়া এবং জাহেরী আমলের হেদায়াত। এহেন হেদায়াত বা পথ নির্দেশকে বুনয়ানী বা তৌফিকী বলা হয়। আর হেদায়াতে খাছ্ছা বা বিশেষ পথ নির্দেশ যাহা নূরে নবুয়ত অথবা নূরে বেলায়াত এর মাধ্যমে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (তাফছীরে আজিজী)। জানিয়া রাখিবেন যে, হেদায়াতে ইলাহীয়া আমাদের জন্য আখেরী হেদায়াত। কিন্তু হুজুর পোরনূর আলাইহিস সালামের ইহাই প্রথম হেদায়াত। অর্থাৎ, খাছ বান্দা জন্মগত ভাবেই আরেফ বিল্লাহ হইয়া থাকেন। হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্ম হইয়াই বলিয়াছিলেন انّى عَبْدُ اللّٰه (ইন্নি আব্দুল্লাহ) এবং হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের সম্পর্কে বলা হইয়াছে- وَاٰتَيْنَاهُ الحكم صَبِيًّا (ওয়া আতাইনাহুল হুকমান ছাবিয়্যা)। এবং আমাদের হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম হইয়াই-দুনিয়ায় শুভাগমণ করিয়াই সেজদা করিয়াছিলেন। কোরআনে কারিমের প্রথম আয়াত নাযিল হইবার সময় হুজুরে পাক এতেকাফরত এবং আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন ছিলেন। হুজুর গাউছে পাক রাদিয়াল্লাহু আনহু রমযানের দিনে মাতৃদুগ্ধ পান করেন নাই। দুনিয়ার সমস্ত জিনিস মারকেজ বা কেন্দ্রস্থল হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু, সত্য মারকেজ বা কেন্দ্রস্থল যাহা আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে পাওয়া যায়। সমস্ত দুনিয়া সমুদ্র হইতে পানি পাইয়া থাকে আর সমুদ্র পানি পায় আল্লাহর কুদ্রত হইতে। সমস্ত তারকা রাজি আলো পায় সূর্য হইতে আর সূর্য

আলো পায় আল্লাহ পাকের কুদ্রত হইতে। সমুদ্রের পানির মার্কেজ (কেন্দ্রস্থল) সূর্য নূর বা আলোর মার্কেজ। অনুরূপভাবে, হেদায়াতের মার্কেজ (কেন্দ্রস্থল) আমাদের আক্বা ও মাওলা মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মাওলানা রুমী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে বলেন, 'ঐ প্রকারের হেদায়াত পাওয়ার জন্য ফখরুদ্দীন রাজী রহমতুল্লাহ আলাইহের মত ইমামের জ্ঞানও যথেষ্ট নহে। কেননা, এই জাতীয় হেদায়াত জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়। এই জন্যেই, সুফিয়ানে কেরাম বলিয়াছেন-জাহেরী আলেমের জ্ঞান দলীল পর্যন্ত এবং সুফিয়ানে কেরামের দলীল কাশফ ও মুকাশেফা পর্যন্ত। অর্থাৎ, জাহেরী আলেম বর্ণনা করেন এবং শায়খে তুরিক্বত প্রদর্শন করেন। জাহেরী আলেম ক্বাল (বর্ণনা) পর্যন্ত আর সুফীগণ হাল (অবস্থা) পর্যন্ত। মাওলানা রুমী রহমতুল্লাহ আলাইহে বলেন-

قال را بگزار مرد حال شو – زیر پائے کاملے پامال شو

سرمہ کن در چشم خاک اولیاء – تابہ بینی ز ابتداء تا انتہا

অর্থ-নানা রকম কথা বার্তা পরিত্যাগ করতঃ তুমি কামেল ব্যক্তির পদতলের মাটি হইয়া যাও, যেন তুমি তাহার পদদলিত হইতে পার। যদি কঠিন পাথর বা মর্মর পাথরও হইয়া থাক তবুও কামেল লোকের সংশ্রবে মূল্যবান রত্নে পরিনত হইয়া যাইবে (মসনবী শরীফ)।

এ আয়াতে কারিমায় ঐ আখেরী প্রকারের হেদায়াত আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদিগকে ঐ জাতীয় হেদায়াত দান কর যাহা অনুভুতি ও জ্ঞানের বাহিরে এবং শুধু তোমার অনুগ্রহের দ্বারা পাওয়া যায়। এই জন্যে বলা হইয়াছে اهد (ইহ্দী) অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি আমাদিগকে হেদায়াত দান কর। এখন ইহার সম্পর্ক অতীত আয়াত সমূহের দ্বারা এইরূপে হইয়াছে যে, প্রথম বলা হইয়াছিল نعبد এবং نستعين যার মধ্যে বান্দা ছিল। অর্থাৎ, হে প্রভু! যে পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান দ্বারা পৌছা যায় ঐ পর্যন্ত তোমার সাহায্যের বদৌলতে আমরা কর্ম করিয়াছি। কিন্তু যাহা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত ঐ পর্যন্ত হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহের সাহায্যে আমাদিগকে পৌছাও। এইস্থানে আল্লাহ পাককে فاعل ফায়েল বা কর্মকর্তা বলা হইয়াছে। এখন نا না-র দ্বারা বুঝানো হইয়াছে ঐ সমস্ত লোক এবং ঐ জামাত যাহারা তুরিকতের বন্ধু; এবং যাহারা হাকিকতের জ্ঞান রাখেন। তাহা হইলে, এই কথাই যেন বলা হইতেছে "হে আল্লাহ! আমরা ঐ জংগলে পদার্পণ করিয়াছি, কিন্তু তোমার সান্নিধ্যে পৌছিবার রাস্তা ঐ রাস্তা যাহার শেষ মনজিল তোমার সান্নিধ্য, অনুগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে ঐ রাস্তা অতিক্রম করিয়া দাও।"

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ছিরাতুল মুস্তাক্বীম

সুফিয়ানে কেরামের নিকট ছিরাতে মুস্তাক্বীমের কতিপয় তাফছীর রহিয়াছে। প্রথমঃ ছিরাতে মুস্তাক্বীম ঐ রাস্তা যাহাতে মুহব্বত এবং আক্বল উভয়ই রহিয়াছে। যাহার নাম ছুলুক। কেননা, শুধু আক্বল বা জ্ঞান যাহা আল্লাহ পাকের ইশক্ব ও মুহাব্বত হইতে খালি উহা বেদ্বীনি বা ধর্মহীনতা। আর শুধু ইশক্ব যাহা জ্ঞান শূন্য উহাকে জযব্। এ উভয় রাস্তায় ইফরাত ও তাফরিত বা সীমা অতিক্রম রহিয়াছে। অপরদিকে, আল্লাহ পাকের ইশক্বও মুহব্বত পরিপূর্ণ মাত্রায় এবং আক্বল বা জ্ঞান বহাল থাকে ইহারই নাম ছুলুক। আর ইহাই ঐ স্থানে উদ্দেশ্য হইতেছে। ছালেক ছুলুকের রাস্তায় চলাচলকারী মযজুব হইতে উত্তম। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের ছিফাতী তাজাল্লী (জ্যোতিঃ) দর্শন করিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাই হইল জযব্ (প্রেমাকর্ষণ বা মূর্ছনা)। অথচ হুজুর পোরনূর মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজ শরীফ এর রজনীতে চর্ম চক্ষুতে আল্লাহ পাকের জাতে ইলাহী দর্শন করিয়া মুচকি হাসি হাসিয়াছিলেন। ইহাই ছুলুকের পথের পরমাদর্শ।

موسی زهوشی زفت بیك پر تو صفات – تو عین ذات می نگری در تبسمی

দ্বিতীয় ঃ যে রাস্তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌছাইয়া দেয় উহাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম। **এতদব্যতীত** যত রাস্তা রহিয়াছে সমস্ত রাস্তায়ই ইফরাত ও তাফরিত তথা সীমা অতিক্রম করার আশংকা ও পথ ভ্রষ্টতা হইতে মুক্ত নহে।

উলাময়ে কেরামের নিকট সঠিক ও বিশুদ্ধ আক্বীদা ক্বাল্ব্ বা অন্তরের সহজ-সরল রাস্তা আর উত্তম ও নেক-আমল হইতেছে **ক্বালেব বা** দেহের সহজ-সরল রাস্তা। ইহাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম যাহা মুমিনকে জান্নাত পর্যন্ত পৌছাইয়া থাকে। সুফিয়ানে কেরামের নিকট সিলসিলায়ে মাশায়েখ সহজ সরল রাস্তা যাহা মুমিনকে আল্লাহপর্যন্ত পৌছাইয়া দেয়। এই দোওয়ার মাধ্যমে কতিপয় মাসআলা জানা যায়।

১নং মাসআলাঃ প্রত্যেক মানুষ সহজ-সরল রাস্তায় মৃত্যুর সময় পর্যন্ত চলিবার পর আপনাপন গন্তব্যস্থল মনজিলে মকছুদে পৌছে। মুসাফীর যেমন আপন মালামাল হেফাজত করিয়া তদ্রুপ, প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ আমল সমূহের হেফাজত করিয়া থাকে।

২ নং মাসআলাঃ- আল্লাহপাকের বড়ই অনুগ্রহ যে, মুমিন বান্দা অনায়াসে সহজ-সরল রাস্তায় বা ছিরাতে মুস্তাক্বীমে চলিবার তৌফিক লাভ করিয়া থাকে। এই হেতু সুরায়ে ফাতেহায় ইহারই প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। 'হে প্রভু! আমাদিগকে

তোমার অনুগ্রহে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে সহজ-সরল পথে চালাও।'

৩নং মাসআলাঃ আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌছা অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা ওয়াছিলা ব্যতীত সম্ভবপর নহে। নতুবা, ছিরাতে মুস্তাকীমের কি প্রয়োজন ছিল। আল্লাহপাক আমাদের নিকটে, কিন্তু আমরা আল্লাহপাক হইতে দূরে। এ কারণেই আমাদিগকে রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। আল্লাহ প্রাপ্তির রাস্তার মুখাপেক্ষী আমরা।

তাফসীরে কবীরে এই জায়গায় একটি চমৎকার হেকায়েত বা কাহিনী উল্লেখ করিয়াছে। তাহা এই-হজরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহে একদা পদব্রজে হজ্জ পালন করিতে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক উট চালক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তরে বলিলেন যে, তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাইতেছেন। উট চালক অবাক হইয়া বলিল 'আপনাকে দেখিয়া একজন পাগল বলিয়া মনে হয়, এত দীর্ঘ ছফর তদুপরি আপনার কোন বাহনও সঙ্গে নাই কিংবা খাদ্য সামগ্রী বা মালপত্রও নাই। হয়তবা পথের মধ্যেই আপনার মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতে পারে। হজরত ইবরাহীম ইবনে আদম লোকটির কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর দিলেন, 'তোমার নিকট একটি যান-বাহন, আর আমার নিকট বহু যান বাহন রহিয়াছে যাহা তুমি দেখিতে পাও না'। হজরত ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহ আলাইহে আরও বলিলেন, 'ওহে শোন, আমার নিকট যখন কোন মুছিবত আসে আমি তখন ছবরের (ধৈর্য্যের) অশ্বে আরোহন করি। আবার যখন আল্লাহ পাকের কোন নিয়ামত প্রাপ্ত হই তখন আমি শোকরিয়ার বাহনে ছওয়ার হই। আবার যখন আল্লাহর পক্ষ হইতে কোন আদেশ প্রাপ্ত হই তখন রেজা বা সন্তুষ্টির ঘোড়ায় চড়ি। আবার যখন নফছ (প্রবৃত্তি) আমাকে কোনও কিছুর প্রতি ডাকে তখন আমি আমার জিন্দেগীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ হীনতার অশ্বে আরোহন করিয়া লই। অতঃপর উট চালক ব্যক্তিটি বলিল, 'নিঃসন্দেহে আপনি আরোহনকারী বটে, আর আমি পদব্রজে চলাচলকারী।' দুনিয়ার ছফরের জন্যে যেমন বিভিন্ন ধরনের যানবাহন যথাক্রমে, কোথাও নৌকা, কোথায়ও রেলগাড়ী, কোথায়ও মোটরগাড়ী কিংবা কোথায়ও লঞ্চ-স্টীমার; আবার কোথায়ও উড়ো জাহাজ ব্যবহৃত হয়; তদ্রুপ, দ্বীনের পথের ছফরে বহু প্রকার যানবাহনের আবশ্যক হয়। এই সমস্ত যানবাহনের লাগাম বা নিয়ন্ত্রণ অন্য কাহারও অধিকারভুক্ত থাকে।

তৃতীয়ঃ সুফীয়ানে কেরামের নিকট দ্বীনের উপর ইস্তেকামাত বা ধর্মের উপর দৃঢ়ভাবে অটল-অনড় থাকাই হইতেছে সহজ সরল রাস্তা। এক ইস্তেকামাত সহস্র কারামতের চেয়েও উত্তম। কেননা, 'ইস্তেকামাত কারামতের উর্ধ্বে।' ইস্তেকামাতের অর্থ এই যে, যদি আল্লাহ পাকের নির্দেশ হয় তবে তুমি সমুদ্রে ঝাঁপ

দাও। ইহা পালন করিতে মুহূর্ত কাল বিলম্ব করিবে না।' যেমন হজরত ইউনুছ নবী আলাইহিস সালামের ঘটনা। যদি নির্দেশ হয় 'তুমি তোমার সন্তানকে কুরবানী করিয়া দাও, তবে তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে ইহাতে রাজী হইয়া যাও।' যেমন হজরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম পালন করিয়াছেন জগৎ সমক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। যদি আল্লাহকে স্মরণ করিতে সম্মুখে অগ্নি আসিয়া উপস্থিত হয়, তথাপি ভয় করিবে না। আল্লাহ পাকের স্মরণ হইতে পশ্চাদপদ হইবে না। যেমন আল্লাহর খলীল হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নমরুদের অগ্নিকুণ্ডকে দেখিয়া বিন্দুমাত্রও ভয় পান নাই। যদি তুমি কোন কামেল পীরের মুরীদ হইয়া থাক, তবে পীরের আদেশ নিষেধ পালন করিতে মোটেও দ্বিধাবোধ করিও না। যেমন হজরত মুসা আলাইহিস সালাম এত বড় জলীলুল কদর পয়গাম্বর হইয়াও হজরত খিজির আলইহিস্ সালামের খেদমতে হাজির হইতেও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। যদি কোন প্রকার বিপদাপদ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয় তবে ছবর বা ধৈর্য্য ধারণ করতঃ শোকর গোজারীর সহিত সম্মুখে অগ্রসর হইবে। যেমন হজরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম-এর সময়ে তাঁহার উপরে অবতীর্ণ বিপদাপদের ক্ষেত্রে তিনি যেভাবে ছবর এখতিয়ার পূর্বক আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

সুফীয়ানে কেরাম বলেন যে, যখন নিজের জান-মাল কিংবা আওলাদ আল্লাহর স্মরণের পথে পরদা বা অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় তখন সেই পরদা বলিষ্ট ভাবে ছিন্ন করিয়া দাও। এই সময় এই ধরনের পরদা ছিন্ন করা অনর্থক কিংবা অন্যায় হইবে না; বরং মাশুকের সাক্ষাতের কারণ (উপলক্ষ্য) হইবে। হজরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের আসরের নামাজ কাজা হওয়ায় তিনি এক হাজার ঘোড়া জবাহ্ করিয়াছিলেন। তখন এই কাজ অনর্থক হয় নাই। বরং পরদা বা অন্তরায় ছিন্ন হইয়াছে মাত্র। অনুরূপভাবে, হজরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের বাদশাহী ত্যাগ করিয়া ফকীরের বেশ ধারণ করা এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠোর রিয়াজত ও মোজাহেদায় কাটাইবার পর একদা তদীয় পুত্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার অন্তরে সন্তানের স্নেহ জাগ্রত হওয়ায় আল্লাহর পক্ষ হইতে তিরস্কৃত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সন্তানের মায়া এই মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণের পথে পরদা স্বরূপ; তাই তিনি প্রার্থনা করিলেন, 'হে পরওয়ারদিগার। এই মুহূর্তে আমার জান অথবা সন্তানের জান তুমি কবুল কর, কেননা আমি পরদা ছিন্ন করিতে চাই।' আল্লাহপাক তাহার পুত্রের জান কুবল করিলেন। ইহারই নাম সুলুকের রাস্তা খোদা প্রাপ্তির পথ সিরাতে মুস্তাক্বীম। সুরায়ে ফাতেহায় ইহারই কামনা করা হইয়াছে 'হে আল্লাহ! আমাদিগকে ছিরাতে মুস্তাকীমের হেদায়াত প্রদান কর।'

اعتراض এ'তেরাজ বা আপত্তি ঃ আড়িয়া সম্প্রদায় এই আয়াতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকে যে, দোয়া করা অনর্থক কাজ। কেননা, যে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, নামাজের জন্য হাজির হয় এবং কোরআন পাঠ করে তখন সে হেদায়াত প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হাছিল হয় নাই, তাহা চাওয়া যায়। তাই, হেদায়াত প্রার্থনা করা একেবারে নিরর্থক।

উত্তর ঃ ইহার উত্তর এই যে, তাফছীরের দ্বারা এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে, হেদায়াতের উপর কায়েম থাকা এবং উহাতে উন্নতিসাধন করা অথবা অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং দুঃখ কষ্ট ও বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক অটল অনড় থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব, যে মানুষ যে ধরনের বা যে স্তরের হেদায়াত ও সে ধরনের বা সে স্তরের লাভ হইয়া থাকে। কাফেরের জন্য হেদায়াত হইল ঈমান আনয়ান করা; মুমিনের জন্য হেদায়াত হইল পরহেজগারী এখতিয়ার করা। মুত্তাকীর জন্য হেদায়াত হইল তাক্বওয়া বা পরহেজগারীর উপর কায়েম থাকা আর যে প্রকারের তেলাওয়াতকারী ঐ প্রকার হেদায়াত। মনে রাখিবেন, আমরা আল্লাহ পাকের ফজল ও করমে হেদায়াতের পথে বা সহজ সরল রাস্তায় ছিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রহিয়াছি; এবং প্রাণ প্রিয় নবী হুজুর সারোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হেদায়াতের সরল-সোজা রাস্তায় কায়েম রহিয়াছেন। কোরআনুল মজীদে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন- اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

(ইন্নাকা লামিনাল মুরছালীন আলা ছিরাতিম্ মুস্তাক্বীম)

অনুরূপভাবে, আল্লাহ পাক স্বয়ং সরল সোজা রাস্তায়। অর্থাৎ, সরল-সোজা রাস্তায় চলিয়া আল্লাহকে পাওয়া যায়, আল্লাহপাক ফরমান-

اِنَّا رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

২নং এতেরাজ বা আপত্তিঃ- আমরা নামাজে এই দোয়া করি যে, 'হে প্রভু! আমাদিগকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন কর, আর নবী রাসুলগণ ও এই দোওয়া করিতেন এবং আওলিয়াগণও এই দোয়াই করিতেন। তাহলে, আমাদের মধ্যে এবং আম্বিয়া আওলিয়াগণের মধ্যে পার্থক্যও তারতম্য কি?

উত্তরঃ রাস্তা সকলেরই এক বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য সকলের এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের সর্বসাধারণের রাস্তার উদ্দেশ্য অগ্নি হইতে মুক্তি পাওয়া। প্রিয় বান্দাগণের উদ্দেশ্য বেহেস্ত গোলজার করা। প্রেমিকের উদ্দেশ্য বা মনজিলে মকছুদ হইল মাশুকের দর্শনলাভ। বরযাত্রী এবং 'বর' রাস্তা সকলেরই এক; সকলে একই রাস্তা অতিক্রম করে। কিন্তু বর যাত্রীদের উদ্দেশ্য হইল পানাহারে অংশগ্রহণ করা। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদিগের উদ্দেশ্য হইল জোড়া বাঁধিয়া

দেওয়া। কিন্তু দুলহা বা বরের উদ্দেশ্য হইল দুলহীন বা বিবিকে লাভ করা। সকলেরই রাস্তা এক বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য ও গন্তব্যস্থল ভিন্ন ভিন্ন। আড়িয়া সম্প্রদায়ের অজ্ঞতার দরুন কাহারও ধোকায় বা প্রতারনায় যেন কেউ না পড়ে।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

(ছিরাত্বাল্লাজিনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম)

অর্থাৎ- তাহাদেরই পথে যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ।

এ আয়াতের সম্পর্ক ঃ পূর্ববর্তী আয়াতের সহিত এ আয়াতের কতিপয় সম্পর্ক রহিয়াছেঃ-

প্রথমতঃ এই যে, সোজা সরল রাস্তার হেদায়াত প্রার্থনা করা হইয়াছিল; যাহার মধ্যে বহু কিছু বিদ্যমান ছিল। উহারই বর্ণনা করিবার জন্য আরজ করা হইয়াছিল যে, 'হে প্রভু! আমরা ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের রাস্তা চাই, যাহাদিগকে তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ-সাহায্য করিয়াছ। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, সহজ-সরল ও সোজা রাস্তা কেবল রাস্তা যাহা আল্লাহর নেক-বান্দাগণ অবলম্বন করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, প্রথম আয়াতে আল্লাহ পাক এর নিকটে রাস্তা রহিয়াছে। এক্ষণে, ঐ রাস্তার যাত্রী বা সাথী পাইতে আবেদন করা হইয়াছে। কেননা, কোন রাস্তাই যাত্রী বা সংগী-সাথী ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না। তবেই, আবেদন করা হইতেছে 'হে আল্লাহ! আমরা ঐ রাস্তার সন্ধান চাই, যাহার মধ্যে তোমার খাছ বান্দাগণের পদচহ্ন রহিয়াছে এবং তাহাদেরই রাস্তায় আমরা উদ্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে পৌছিতে সমর্থ হইব।

তৃতীয়তঃ এই যে, সোজা রাস্তা ঐ রাস্তা ইহাতে ইফরাত ও তাফরীতের আশংকা রহিয়াছে, আর ঐ রাস্তা প্রকাশ করার জন্য তিনটি জামাআতের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। তন্মধ্যে, মধ্যবর্তী রাস্তাটিই আল্লাহর খাছ বান্দাগণের রাস্তা যাহা ছিরাতে মুস্তাক্বীম। ইফরাত সম্পন্ন রাস্তা হইল مغضوب عليهم এর রাস্তা এবং তাফরিত সম্পন্ন রাস্তা হইল ضالين দ্বোয়াল্লিনের রাস্তা। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, সহজ সরল রাস্তা ছিরাতে মুস্তাক্বীমের সীমা নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সীমা লংঘনকারী একটি রাস্তা অভিসপ্তদিগের রাস্তা আর একটি সীমালংঘনকারী রাস্তা দ্বোয়াল্লিন বা পথ ভ্রষ্ট দিগের রাস্তা। একটি ঐতিহাসিক তথ্য বা ধ্রুবসত্য হইল একটি সীমা অতিক্রমকারী (ইফরাতীদল) হইল অভিসপ্ত ইহুদী সম্প্রদায়, আরেকটি সীমা লংঘনকারী (তাফরিতী দল) হইল পথ ভ্রষ্ট নাছারা সম্প্রদায়। কজেই, পরবর্তীতে যাহারা সীমা অতিক্রমকারী যাহারা ইহুদী-নাছারাদের ন্যায় তাহারাও অভিসপ্ত কিংবা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

উলামায়ে কেরাম বলিয়াছেন যে, রাস্তা মূলতঃ দুইটি, একটি সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার দিকে, আরেকটি স্রষ্টা হইতে সৃষ্টির দিকে। যে রাস্তাটি সৃষ্টি হইতে স্রষ্টার দিকে উহা খুবই ভয়াবহ ও বিপদ সংকুল। আর ঐ রাস্তা হইতে বহু কাফেলা ফিরিয়া আসিয়াছে কেননা, এই রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে ডাকাতি-রাহাজানি হইয়া থাকে। ডাকাত দলের নেতা শয়তান মালাউন ঘোষণা দিয়াছে-

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ (লাআক্বউদান্না লাহুমা ছিরাতাকাল মুস্তাক্বীমা)

অতএব, ভয়ানক রাস্তায় চলিতে ঐ কাফেলার সঙ্গ লাভ করা উচিত যে কাফেলার সহিত নিরাপত্তা রক্ষী রহিয়াছে। যেমন- কোন কাফেলায় সরকারী কর্মকর্তা থাকেন এবং রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা প্রহরী প্রহরারত থাকে। যাহার ফলে, রাস্তায় ডাকাত দলের কারসাজি ও দূরভিসন্ধি হিম্মত পায় না যে, ঐ কাফেলায় হামলা করিবে। অতএব, জানা দরকার যে, আমাদের ঐ কাফেলার নিরাপত্তা বিধানকারী ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ, যাঁহাদের সম্পর্কে এনাম প্রাপ্ত (পুরস্কৃত) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

اَنْعَمْتَ (আনয়ামতা) শব্দটি انعام হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহার অর্থ-নেয়ামত দেওয়া। نعمت নিয়ামত-এর আভিধানিক অর্থ নরমি বা কোমলতা। এইজন্য, আরববাসীগণ নরম কাপড়কে 'ছাত্তবে' নায়েম এবং নরম চামড়াকে 'জিলদে নায়েম বলিয়া থাকেন। পরিভাষায় নিয়ামত বলা হয় স্বাদ-আস্বাদনকে। এখন নিয়ামত দ্বারা বুঝায় ঐ বস্তুসমূহ যাহা দ্বারা মানুষ শান্তি লাভ করে। এই কারণে, ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতিকে নিয়ামত বলা হয়। নিয়ামত তিন প্রকার ঃ- (এক) বিনা কারণে বা প্রচেষ্টায় প্রকাশ লাভ ঘটে। যথা-জিন্দেগী, শৈশবের রিযিক এবং হেদায়াত প্রভৃতি যাহাতে মানুষের কোন হাত নাই। (দুই) ঐ নিয়ামত যাহা বাহ্যিকভাবে, কোনও বান্দার মাধ্যমে লাভ হয়। যেমন-দুনিয়ার সম্পদ ইত্যাদি। (তিন) যাহা আমরা আমলের দ্বারা লাভ করিতে পারি। যেমন-কতক আমলের দ্বারা রিযিক বৃদ্ধি পায়, পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা বিভিন্ন ধরনের বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করা যায়; এবং নেক আমল বা পূণ্যকর্মের দ্বারা বেহেশত ও বেহেশতের নিয়ামত সমূহ লাভ করা যায় ইত্যাদি (তাফছীরে কবীর)। এই তিন প্রকার নিয়ামতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যেমন এক ব্যক্তি ঈমান ও আমলের দ্বারা বেহেশত লাভ করিয়াছে সে অনুগত বান্দা। দ্বিতীয়তঃ যে কেহ আমল ব্যতীত কোন মহান ব্যক্তির ওয়াছিলার মাধ্যমে বেহেশত পাইয়াছে

যেমন- মুসলমানের শিশু সন্তান শৈশব কালে ইন্তেকাল করিয়াছে।

তৃতীয়ত ঃ কোন কারণ ব্যতীত কেহ কেহ বেহেশ্‌ত লাভ করিয়াছে। যেমন ঃ- হুর ও গেলমান প্রভৃতি এবং আল্লাহ পাকের ঐ সমস্ত সৃষ্টি যাহা দ্বারা বেহেশ্‌তকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রথম প্রকার নিয়ামত আবার দুই প্রকার ঃ- (এক) **দুনিয়াবী**, যেমন আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বাহ্যিক শক্তিসামর্থ্য ইত্যাদি। (দুই) **ধর্মীয়**, যেমন ঈমান এবং হেদায়াত ইত্যাদি দ্বীনি নিয়ামত। তখন আয়াতে কারিমার মর্ম এই হইবে যে, 'হে আল্লাহ! ঐ সমস্ত লোকদিগের রাস্তায় চালাও যাহাদিগকে দ্বীনী নিয়ামতের দ্বারা সৌভাগ্যবান দিগের মধ্যে শামিল করিয়াছ। ঐ সমস্ত এনয়াম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সম্পর্কে কোরআনে কারিমে এক জায়গায় ইরশাদ হইয়াছে-

أُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ

অর্থঃ- তাহারা ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ লাভ করিবে যাঁহারা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে এনয়াম বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ এনাম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ হইতেছে নবীগণ, সিদ্দিকগণ এবং শহীদগণ ও সালেহীন তথা পূণ্যবান ব্যক্তিগণ। প্রতীয়মান হইল যে ঐ সমস্ত এনাম প্রাপ্ত বা পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ৪ (চার)টি জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। যথা- (১) পয়গাম্বর বা নবী রাসুলগণ আলাইহিমুসসালাম, (২) সিদ্দিকীন, (৩) শুহাদা বা শহীদগণ এবং (৪) সালেহীন বা পূণ্যবান মহাত্মাগণ আলাইহিমুর রাহমাত ওয়ার রেদওয়ান।

আমি নিয়ামতের প্রকার ভেদ এই জন্যেই উল্লেখ করিলাম যে, যদি প্রকৃত পক্ষে সমস্ত নিয়ামত বুঝাইত তবে আয়াত শরীফ মর্মে ইহাতে সমস্ত কাফের মুশরিক মুনাফেক এমনকি ফাছেক ফাজেরও শামিল হইয়া পড়িত। অথচ ইহা নিছক বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নহে। আর, অজ্ঞ ও মূর্খ লোকেরা যুক্তি খাড়া করিত যে, সাধারণভাবে নিয়ামত মুমেন কাফের, মুনাফেক ফাজের সবাইতো-প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন- জিন্দেগী, মাল দৌলত, আওলাদ ও হুকুমত ইত্যাদি ইত্যাদি। আল্লাহ পাকের নিয়ামত হইতে কেহই বঞ্চিত নহে। পক্ষান্তরে, দুনিয়ার নিয়ামত দ্বীনে নিয়ামতের তুলনায় অতিশয় নগন্য। দুনিয়ার নিয়ামত ধ্বংসশীল আর পরকালীন ও দ্বীনি নিয়ামত অবিনশ্বর। আর এই স্থানে আয়াতের মর্মে আল্লাহ পাক কামেল বা পূর্ণ নিয়ামতেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

ফায়দা বা উপকারিতা ঃ- এ আয়াতে কারিমা দ্বারা কতিপয় উপকারিতা পাওয়া যায়।

প্রথমত ঃ- এই যে, হজরত আবুবকর ছিদ্দিক রাদিয়াল্লাহুর খেলাফত সত্য।

কেননা, এ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'তোমরা ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণের রাস্তা আল্লাহর নিকট কামনা কর যাহাদিগকে নিয়ামত প্রদান করা হইয়াছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, 'যাহারা নিয়ামত প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহারা হইলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ছিদ্দিকীন এবং ইসলামে সিদ্দিকীন দিগের শিরোমনী হজরত সিদ্দিকে আকবর আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। কেননা, সিদ্দিক শব্দের অর্থ হইল সত্যবাদী, সত্যাগ্রহী তথা পরম সত্যনিষ্ঠ। অর্থাৎ, কথায়, কাজে, ঈমানে ও আমলে আখলাক্বে যথাযথভাবে সত্যনিষ্টা, যাহার মধ্যে পাওয়া যায়। হজরত আবুবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে ঐ সমস্ত গুনাবলী পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান ছিল। কেননা, আল্লাহ পাক হজরত আবুবকরকে সাহাবী বলিয়াছে এবং মুত্তাক্বী উপাধি প্রদান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন-

اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ

এবং অন্যত্র ইরশাদ করিয়াছেন ঃ-

وَسَيُجَنَّبُوْهَا الاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَه يَتَزَكّٰى

আরও বহু আয়াত হজরত সিদ্দিকে আকবার রাদিয়াল্লাহু আনহুর শানে নাযিল হইয়াছে। যাহার তাফছীর ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে উল্লেখিত হইবে। সিদ্দিকের অর্থ এই যে, যিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক বেশী সত্য বলিয়া অন্তরে দৃঢ় ধারনা পোষণ করিতেন। কতক লোক প্রিয় নবীজীকে মুজেজার দ্বারা জানিত এবং কতক লোক দলীলের দ্বারা জানিত; কিন্তু হজরত সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবীজীকে অন্তরের দ্বারা জানিতেন। তিনি অন্তরের সহিত ঈমান ও ঈমানিয়াতকে (ঈমানের বিষয় সমূহকে) আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খারাপ বিষয় হইতে দূরে থাকিতেন এবং সমস্ত বিষয় আবুবকর সিদ্দিকের মধ্যে অতিশয় উচ্চ মর্যাদার সহিত বিদ্যমান ছিল। কেননা, তিনি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে কখনও ভূত পূঁজা করেন নাই এবং জিনা ব্যভিচার জুলুম ইত্যাদি জাহেলিয়া যমানার কোনও অপবিত্রতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। উপরন্তু, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুজেজা ব্যতীতও মানিতেন এবং হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ব-শরীরে মেরাজকে বিনা দলীলে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এখন এই আয়াতের দ্বারা এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ পাক আমাদিগকে আদেশ দিয়াছেন যে, আমার নিকট ঐ রাস্তায় হেদায়াত প্রার্থনা কর যে রাস্তায় আবুবকর সিদ্দিক এবং সকল সত্যবাদীগণ ছিলেন। যদি আবুবকর সিদ্দিক মাআজ আল্লাহ গোমরাহ হইতেন তবে তাহার অনুসরণের আদেশ হইত না।

দ্বিতীয় ফায়দা ঃ দ্বিতীয় উপকারী শিক্ষা এই পাওয়া যায় যে, কোনও ইমামের তকলিদ করা একান্ত দরকার। কেননা, এ আয়াতে শুধু সিরাতে মুস্তাক্বীমের

মধ্যেই যথেষ্ট করেন নাই, বরং ইহার সহিত ঐ রাস্তার ইমামের অনুসরণ করিবারও আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে জানা গেল যে, আমাদের জন্য রাস্তাও দরকার এবং রাস্তার সন্ধানকারীর দরকার। ঐ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, সোজা রাস্তা উহাই যাহার উপর আল্লাহর নেকবান্দাগণ রহিয়াছেন কিংবা চলিয়াছেন সাহাবায়ে কেরামের পর তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন হইতে শুরু করিয়া এই পর্যন্ত আল্লাহ পাকের সমস্ত নেক্কার বান্দাগণ মুফাচ্ছিরীন মুহাদ্দেসীন,ফোকাহা ও আওলিয়া আল্লাহ তথা সর্ব সাধারণ মুসলমানগণ কোন না কোন ইমামের মুকাল্লিদ হইয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহই গায়রে মুকাল্লিদ নহেন। ইহাতে জানা গেল যে, তাকলিদ হইতেছে আল্লাহ পাকের নেক্কার বান্দাগণের রাস্তা। যদি তাকলিদ করা হারাম ও শিরক হয় তবে দুনিয়া হইতে হাদিছের এলেম মিটিয়া যাইবে। কেননা সমস্ত মোহাদ্দেছীন মুকাল্লেদীনের সাগরেদ এবং হাদিছের সনদে একজন ফাছেক থাকিবে ঐ হাদিছ গ্রহণযোগ্য নহে। তবে এই কায়দায় যে হাদিছের সনদে একজন মুকাল্লিদ থাকে উহা গ্রহণযোগ্য নহে। তখন বোখারী, মুসলিম, তিরমিজ সব খতম। কেননা, তাহাদের কোন ছনদ মুকাল্লিদ হইতে খালি নহে।

তৃতীয় ফায়দা বা উপকার ঃ ইহাতে জানা যায় যে, ভাল মানুষের গোলামী করা ভাল এবং খারাপ মানুষের গোলামী করা খারাপ। কেননা, কোরআনে কারিমে কাফেরদের একটি দোষ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা নবীগণের শিক্ষার বিরুদ্ধে নিজেদের জাহেল বাপ দাদাদের অনুসরণ করে। এই জায়গায় মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, তোমরা আমার নিকট এই দোওয়া প্রার্থনা কর 'হে আল্লাহ! আমাদিগকে ঈমনাদার বাপ-দাদার রাস্তায় চালাও। ঐ আয়াত কাফেরদের অনুসরণের খারাবী বয়ান করা হইয়াছে এবং এই আয়াতে ঈমানদার মুসলমানের অনুসরণের মঙ্গল বয়ান করা হইয়াছে।

চতুর্থ ফায়দা বা উপকার ঃ ইহাতে এই উপকার পাওয়া গেল যে, যে রাস্তায় আল্লাহর নেক বান্দাগণ চলাচল করেন উহাই সরল সোজা রাস্তা। আর যে বিষয়কে আল্লাহর নেকবান্দার দৃষ্টিতে মুস্তাহাব তাহা মুস্তাহাব। ইহার তাফছির ঐ হাদিছ দ্বারা পাওয়া যায় যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন -

ما راه المومنون حسنا فهو عند الله حسن

অর্থাৎ- মুমিন যাহা ভাল জানে আল্লাহর দরবারেও ভাল। দ্বিতীয় হাদিছে রহিয়াছে- انتم شهداء الله فى الارض

হে মুসলমান! তোমরা জমিনের উপরে আল্লাহর স্বাক্ষী। যে জিনিস অথবা মানুষকে তোমরা ভাল জান আল্লাহর দরবারেও ভাল। কেননা, তোমাদের যবান, আল্লাহপাকের কলম। যেহেতু, মাহফিলে মিলাদ শরীফ, ফাতেহা, ওরছে বুজুর্গান-এর ন্যায় পবিত্র অনুষ্ঠান সমূহ আরবও আজমের আলেম ফাজেল,

আবেদ যাহেদ তথা সমস্ত নেককারগণ এবং পীর মাশায়েখগণ ভাল জানেন এবং উহা পালন করিয়া থাকেন কাজেই এই সমস্ত বরকতময় অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে জায়েজ ও মুস্তাহাব। আর ঐ সমস্ত নেককর্ম সমূহকে মুস্তাহাব ধারনা করাই সহজ-সরল রাস্তা। প্রমাণিত হইল যে, মজহাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সত্য। মুষ্টিমেয় দেওবন্দী-ওয়াহাবী মোল্লাদের প্রলাপ-উক্তিতে সমস্ত পৃথিবীর আলেমগণকেও আউলিয়াগণকে মুশরিক বলা যাইতে পারে না। অথচ ঐ দেওবন্দী ওয়াহাবীদেরকে বেদ্বীন বলা সহজ।

শুক্রবার দিন জুময়ার নামাজে ইমামের সামনে মসজিদের বাহিরে দরজায় আজান দেওয়া সন্নাতে রাসুল ও সুন্নাতে খোলাফায়ে রাশেদীন। এই সুন্নাতকে মানেনা, এই জন্যে ইহাদের পিছনে নামাজ পড়া হারাম।

পঞ্চম ফায়দা বা উপকারঃ যে ধর্মে এবং মজহাবে অলি আল্লাহগণ আছেন তাহা সত্য এবং যে ধর্মে অলি আল্লাহ নাই তাহা মিথ্যা। যে বৃক্ষের ফুল ও ফল আছে এবং উহার মূলের সহিত সম্পর্ক রহিয়াছে উহার সেবা ও যত্ন করা হয়। আর যে বৃক্ষের মূল কাটা হইয়াছে এবং মূল শুকাইয়া গিয়াছে উহার সেবা যত্নতো হয়-ই-না বরং উহা আগুনের খোরাকে পরিণত হয়। দেখুন বনি ইছরাঈল বা ইহুদীদের ধর্ম যতদিন মনছুখ বা স্থগিত হয় নাই ততদিন পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে অলি আল্লাহ ছিল। হজরত বিবি মরিয়ম আলাইহিচ্ছালাম, আছুফ ইবনে বরখিয়া, এবং আছহাবে কাহাফ তাহারা আল্লাহ পাকের অলি ছিলেন। কিন্তু সেই ধর্ম মনছুখ হইবার পর সেই ধর্মের অনুসারীগণ পথহারা হইয়া যায় এবং বেলায়াতও খতম হইয়া যায়। ফলকথা, অলি আল্লাহগণ ধর্মের প্রদীপ স্বরূপ পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রথম হইতেই অলি-আল্লাহগণ মজহাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছেন এবং অবশেষে, কিয়ামত পর্যন্তই থাকিবেন। রাফেজী, খারেজী ওয়াহাবী দেওবন্দী এবং শিয়া-কাদিয়ানী ফেরকায় অলি নাই। কারণ ইহারা ধর্মের মূল কাটিয়া ফেলিয়াছে। অলির তিনটি পরিচয় রহিয়াছে ঃ- (১) ঈমান, (২) তাকওয়া (পরহেজগারী) এবং (৩) সর্বসাধারণের নিকট অলি রূপে পরিচিতি লাভ করা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

(আল্লাজিনা আমানু ওয়াকানু ইয়াত্তাকুন) অর্থাৎ, অলি তাহারই যাহারা ঈমান ও তাকওয়া অর্জন করিয়াছেন।

তাফসীরে সুফিয়ানা تفسير صوفيانه

সুফিয়ানে কেরাম বলেন اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (আনয়ামতা আলাইহিম) দ্বারা ঐ মহাত্মাগণ হইতেছেন যাহাদের উপর আল্লাহ পাকের বাতেনী নিয়ামত

নাযিল হইয়াছে এবং যাহাদের উপর নূরের ছিটা পড়িয়াছে। কেননা, মেশকাত শরীফে বাবুল ঈমান বিল কদরের মধ্যে রহিয়াছে, আল্লাহপাক হজরত আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ হইতে সমস্ত রুহ্ সমূহ বাহির করিবার পর নূরের ছিটা দিয়াছেন। কতক লোকের উপর সেই নূরের ছিটা পড়িয়াছে আর কতক লোক বঞ্চিত রহিয়াছে। যাহাদের উপর ঐ নূরের ছিটা পড়িয়াছে তাহারাই হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে এবং যাহারা বঞ্চিত রহিয়াছে তাহারা প্রথভ্রষ্ট থাকিবে। কামেল ব্যক্তি ঐ নূরের দ্বারা সত্য কথাকে জানিয়া লন আর সাধারণ লোকেরা তাহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা পৃথক রহিয়াছে তাহারাই অজ্ঞতার অন্ধকারে রহিয়াছে। কাজেই, আনয়ামতা দ্বারা বুঝায় আওলিয়ায়ে কেরাম এবং ছালেকীন (ছুলুকের পথের পথিক) সুফিয়ানে কেরামের নিকট কাফের সম্প্রদায় اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আনয়ামতা আলাইহীম এর মধ্যে শামিল নহে বরং বহির্গত। কেননা, তাহাদিগকে কোন প্রকার নিয়ামত দেওয়া হয় নাই। দুনিয়ার নিয়ামত যাহা মাল দৌলত, আওলাদ ইত্যাদি কেবল মুসলমানদের জন্যই নিয়ামত কিন্তু, কাফের-মুশরিকদের জন্য জহমত বা আপদ স্বরূপ। যাহা নিয়ামতের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, দুনিয়ার নিয়ামত দ্বারা মুসলমানদিগের উন্নতি সাধণ হয় আর কাফেরদের অহংকার বৃদ্ধি পাইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। কোরআনে পাকে ইরশাদ হইয়াছে- وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا

نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِاَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْا اِثْمًا

ইহার উদাহরণ এই রকম বুঝিয়া নিন, যেমন- কোন এক ব্যক্তি তাহার দোস্তকে ভাল হালুয়া খাওয়াইয়াছে এবং দুষমণকে বিষ মিশ্রিত হালুয়া খাওয়াইয়াছে। উভয়কেই হালুয়া খাওয়াইল বটে, কিন্তু পরিনামে দোস্তের জন্য হইল নিয়ামত এবং দুষমনের জন্য হইল তার বিপরীত জহমত। একই হালুয়া একজনের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকারী এবং আরেক জনের জন্য স্বাস্থ্য হানীকারী বা প্রাণ নাশক। তদ্রুপ, একই নিয়ামত ঈমানদার ও কাফের উভয়েই পাইয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে মুমিন-মুসলমান উপকৃত হয়, এবং কাফেরের কুফুরী আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইহেতু, কাফেরের জন্য নেয়ামতও নেয়ামত না হইয়া বিষাক্ত হালুয়ার মতই ক্রিয়া করে। সুফিয়ানে কেরাম এই আয়াতের মর্মে বলেন- দুনিয়ায় সকলেই মুসাফীর, পরকালের পথের যাত্রী। কাজেই, প্রত্যেক মুসাফীর মুমিনের উচিত পথের সাথীরূপে কামেল পীরের ওছিলা অবলম্বন করা।

মাওলানা রুমী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) বলেন-

پیر را بگزیر که بے پیرایں سفر – هست بس پر آفت وخوف و خطر

چوں گرفتی پیر هیں تسلیم شو – همچو موسی زیر حکم خضر رو

বফজলে খোদাওয়ান্দে কারীম পীরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথাস্থানে বাইয়াতের প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

مسئلہ মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা ইন্‌শাআল্লাহ ইহাও জানা গেল যে, মুসলমানের এজমা কোনও মাসআলার ক্ষেত্রে এত্তেফাক বা ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত শরীয়তের দলীল। যে ব্যক্তি এজমায়ে উম্মত হইতে দূরে সে অবশ্যই ভয় ভীতির অন্তর্ভূক্ত রহিল। অতএব, মুসলমানদিগের জামায়াতের অন্তর্ভূক্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন; বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার পরিনাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

اعتراض এ'তেরাজ ঃ সিরাতে মুস্তাকীম বা সহজ-সরল রাস্তা এবং নবীগণ, আওলিয়াগণ ও আলেমগণ পৃথক পৃথক রাস্তায় থাকেন, তাহা হইলে এক রাস্তা কেমন করিয়া হইতে পারে? কেননা, প্রত্যেক নবীগনের শরীয়ত পৃথক পৃথক, আওলিয়াগণের ত্বরিকার সিলসিলা যেমন- কাদেরীয়া, চিশতীয়া এবং সোহরাওয়ার্দ্দীয়া ও নক্‌শেবন্দিয়া ইত্যাদি। আবার উলামাগণের মজহাব ও আলাদা আলাদাঃ- যেমন- হানাফী, শাফেঈ, মালেকী ও হাম্বলী প্রভৃতি। এ সমস্ত পৃথক পৃথক রাস্তা সমূহকে আলাদা না বলিয়া এক রাস্তা বলিবার কোনও যুক্তি নাই।

جواب উত্তরঃ- তাফসীরে আজিজীতে ইহার উত্তর খুবই সুন্দরভাবে উদাহরণসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা এই যে, কোন একটি কাফেলা একটি রাস্তা অতিক্রম করিতেছিল। কিন্তু পেশাগত ভাবে বিভিন্নজন বিভিন্ন কাজের লোক। কেহ দরজির কাজ করে কেহ কর্মকারের কাজ, কেহ শ্রমিক, বোঝাটানে, আবার কেহ নৌকার মাঝি এবং কেহ নিরাপত্তা রক্ষী বা চৌকিদার। তবে সকলেই এক রাস্তার যাত্রী, গন্তব্যস্থল সকলেরই এক জায়গায়। নিজ নিজ যোগ্যতা, শক্তি সামর্থ্য ও পেশা অনুযায়ী একেক জন একেক কাজ করিয়া থাকেন। একদিন সকলেই এক জায়গায় মিলিত হইবেন। কেননা, মৌলিকভাবে তাহারা নীতি আদর্শের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন রাস্তায় বা সিরাতে মুস্তাক্বীমে কায়েম রহিয়াছেন।

غیر مقلدوں کا اعتراض **গায়রে মুকাল্লেদদিগের প্রশ্ন**

গায়রে মুকাল্লেদ ওয়াহাবী সম্প্রদায় উক্তি করিয়া থাকে -সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর মকবুল বান্দা ছিলেন, তাহাদের রাস্তায় চলা হেদায়াত এবং তাহাদের রাস্তাই সহজ সরল সোজা রাস্তা। সাহাবাগণ কাহারও তকলিদ করেন নাই। তাহাদের যুগে কোন মজহাবও ছিল না। কাজেই, চার মজহাব-হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী প্রভৃতির অনুসরণ কিংবা তাকলিদ করা কোন ক্রমেই সোজা রাস্তা হইতে পারে না।

جواب **উত্তর ঃ-** এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর রহিয়াছে। একটি এলজামী (যুক্তিমূলক) যার দ্বিতীয়টি তাহকিকী (বিশ্লেষণ মূলক)। প্রথমোক্ত জওয়াব হইতেছে এই যে, নবীগণের রাস্তা সোজা-সরল রাস্তা অবশ্যই বটে এবং কোন নবী অপর কোন নবীর উম্মত হন নাই। কাজেই কোন নবীর পক্ষে উম্মত না হওয়াই সুন্নাতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। তকলিদ অস্বীকারকারী নজদী ওয়াহাবী ও লা-মজহাবীদের উচিত কাহারও উম্মত না হওয়া। দ্বিতীয় তাহকিকী উত্তর এই যে, সাহাবায়ে কেরাম গণের মধ্যে আসল তকলিদ ছিল। গায়ের ফকীহ্ সাহাবাগণ ফকীহ্ সাহাবাগণের তকলিদ বা অনুসরণ করিতেন। সাহাবায়ে কেরামগণ যাহারা ফকীহ ছিলেন তারা কোরআনুল কারিম ও হাদিস শরীফ হইতে কিয়াছ করিয়া মাসআলা বাহির করিতেন। এখন রহিল ঐ যুগে কতক মজহাব হইল কেন? ইহার উত্তরে বলিতে হয় এবং অবশ্য জানা দরকার যে সাহাবায়ে কেরাম রেদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈনের মুবারক সিনায় হুজুর নূরে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোহবাতের 'নূর' বিরাজমান ছিল। এই হেতু আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রত্যেককে হেদায়াতের আলোক বর্তিকা উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ আখ্যা দিয়াছিলেন। উপরন্তু, সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগে খুঁটিনাটি মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদ কম ছিল। পথভ্রষ্টকারী গোমরাহ ফেরকা সমূহ ছিল না। কাজেই ঐ সময় আইন-কানুন সমূহ তরতিব অনুযায়ী সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই। পরবর্তীতে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হইল এবং মুসলমানদিগের মধ্যে দূর্বলতা আসিয়া পড়িল। সুতরাং মুসলিম মিল্লাতকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত করা জরুরী হইয়া পড়িল ইহার দৃষ্টান্ত এই রকম বুঝিতে হইবে যেমন, সাহাবায়ে কেরামের যুগে কোরআন মজীদের মধ্যে এরাব্ অর্থাৎ যের, জবর, পেশ ছিল না এবং মদ ও তাশ্দিদ তথা রুকু ও মনযিলে বিভক্ত ছিল না। এমন কি, কোরআন মজীদ ত্রিশ পারায়ও বিভক্ত ছিল না। পরবর্তীতে, প্রয়োজনের তাকিদে তাহা হইয়াছে। অতঃপর, হাদিস শরীফে ফন বা বিষয় ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস কিংবা আসমাউররেজাল এর তরতিবও ছিল না। হাদিস শরীফের সনদের উপরও জেরাহ্ বা বির্তক ছিল না। হাদিস শরীফ কিতাবের আকারেও সন্নিবেশিত হয় নাই। সমস্তই সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগ তাবেঈন ও তা'বে তাবেঈনগণের যুগে হইয়াছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের সময়ে ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় নাই। যখন যে বিষয়ের প্রয়োজন হয়, কাজও তখনই হইয়া থাকে, এক্ষণে, কোন বেকুফ লোক যদি এলমে হাদিস-চর্চ্চা করা সম্পর্কে এবং এলমে হাদিসের গুরুত্ব অনুধাবনকে সাহাবায়ে কেরামের তরিকার খেলাফ বলিয়া উক্তি করে তাহাকে নিরেট মূর্খ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

এই শ্রেণীর লোক এলেম ও আমল উভয় হইতেই দূরে অবস্থানকারী জাহেল মাত্র।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! জানিয়া রাখুন, এলমে হাদিসের চর্চা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যেমন জরুরী এলমে ফেকাহও অনুরূপ জরুরী। যদি কেহ এলমে ফেকাহ অমান্য করিয়া ফকীহগণের রায়কে অস্বীকার করে তবে যে মাসআলা কোরআন হাদিসে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না সে ব্যক্তি ইহা কেমন করিয়া পালন করিবে। যেমন একটি প্রশ্ন আসে- যে উড়ো জাহাজে ভ্রমণকালে ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ কিভাবে আদায় করিবে? আবার লাউডস্পীকার যোগে নামাজ আদায় করা জায়েজ, না, নাজায়েজ, রেডিও বা টেপ-রেকর্ডার এর আওয়াজে যদি সেজদার আয়াত তেলাওয়াত শ্রবণ করা হয় তখন সেজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হইবে কিনা? অথবা যদি জুময়ার নামাজে প্রথম রাকাতে জমাত পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় রাকাতে জমাত না থাকে তবে জুময়া পড়িবে না জহুর পড়িবে ইত্যাদি ইত্যাদি বরং এই ধরনের শতাধিক মাসায়েল রহিয়াছে যাহার সুস্পষ্ট আদেশ বা মিমাংসা কোরআন-হাদিসে পাওয়া যায় না। যদি ফেকাহ-শাস্ত্রকে অস্বীকার করা হয় তবে ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল পালনে কি উপায় হইবে। এই বিষয়ের পূর্ণ বাহাছ বা বিশদ-বিশ্লেষণ ইনশাআল্লাহ এ আয়াতে কারিমায় আসিবে।

اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর, এবং তোমাদের উলিল আমরদিগের অনুসরণ কর।"

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

(গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম্ ওয়ালাদ দাল্লীন)

"তাহাদের পথ নহে যাহারা অভিসপ্ত এবং যাহারা পথ ভ্রষ্ট।"

এই আয়াতের সম্পর্ক ঃ

এ আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের সহিত কয়েক প্রকার।

প্রথমতঃ এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে صراط مستقيم সিরাতে মুস্তাক্বীমের অবস্থা ও পরিচিতি বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন বিষয় বা বস্তুর পরিপূর্ণ অবস্থা ও পরিচিতি তখনই জানা যায় যখন উহার কিছু নিশান বা চিহ্ন পাওয়া যায় এবং উহার বিপরীত বিষয়বস্ত সম্পর্কেও জানা যায়। কাজেই, এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে তো সিরাতে মুস্তাক্বীমের আলামত বর্ণনা করা হইয়াছে আর এ আয়াতে সিরাতে মুস্তাক্বীমের বিপরীত বক্র রাস্তার পরিচিতি ও বর্ণনা করা হইতেছে যেন সোজা রাস্তা ও বাঁকা রাস্তার পার্থক্য করন সহজ বোধ্য হইয়া যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের আলোচনা করা হইয়াছে যাহা শ্রবণ করতঃ মানুষের অন্তরে আশা-ভরসার সঞ্চার হয়। এক্ষণে, আল্লাহর

আজাব গজবের আলোচনা হইতেছে যেন মানুষের ভয়ভীতি উদয় হয়। আর ঈমান ভয় ও আশার মধ্যবর্তী অবস্থানে স্থিতিশীল হইয়া থাকে। অন্যকথায় বলা যায় ঈমানে দুইটি বাহু একটি ভয় এবং অপরটি আশা-ভরসা। যেমন পাখির দুইটি পাখা যাহা দ্বারা পাখি উড়িয়া থাকে। পাখা ব্যতীত পাখি উড়িতে পারে না। অনুরূপভাবে, মুমিন বান্দা ভয় ও আশা অন্তরে পোষণ করিয়াই নিরাপদে রাস্তা অতিক্রম করিয়া থাকে। এতদব্যতীত রাস্তা অতিক্রম সম্ভবপর নহে। অবশ্য এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও আবশ্যক।

তৃতীয়ত ঃ পূর্বোক্ত আয়াতে ঐ সমস্ত লোকজনের প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে যাহাদের উপর আল্লাহপাক নিয়ামত বা অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়াছেন। অর্থাৎ যাঁহারা নিয়ামত প্রাপ্ত এবং যাহারা আল্লাহর গজবের ভয়ে বদ-আমল ও গোমরাহী হইতে এবং বদ এতেকাদী হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। মোটকথা এই যে, আল্লাহ পাকের এনাম প্রাপ্ত যাঁহারা তাঁহাদের পরিচয় হইল তাহাদের আক্বায়েদ ও আমাল দুই-ই বিশুদ্ধ থাকিবে; তাঁহারা কাফেরও হইবে না কিংবা ফাছেক ও হইবে না।

تفسير عالمنه তাফছিরে আলেমানা

غير 'গায়র' শব্দের তিনটি অর্থঃ 'না' 'ব্যতীত' ও 'কিন্তু'। এ স্থানে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য হইতে পারে। غضب 'গজব' শব্দের আভিধানিক অর্থ জোশ এবং বদল হওয়া। এসতেলাহী বা পারিভাষিক অর্থ গজব ঐ অবস্থার নাম যাহা দ্বীলের মধ্যে উদয় হয় এবং বদলা বা প্রতিশোধ লওয়ার ধারনায় জোশ পয়দা হয় এবং অবস্থার পরিবর্তন হয়। আল্লাহ পাক যেহেতু দ্বীল হইতে এবং দ্বীলের অবস্থার পরিবর্তন ইত্যাদি হইতে পবিত্র, কাজেই এই স্থানে ইহার অর্থ হইবে 'ইরাদায়ে আজাব' অর্থাৎ, শাস্তি দানের ইচ্ছা।

ضال 'দ্বাল' শব্দটি আম বা সাধারণভাবে গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট অর্থাৎ বদ আক্বীদা সম্পন্ন বুঝায়। কোরআনে কারিমে কোন কোন স্থানে আম্বিয়ায়ে কেরামের শানে ضلال (দ্বালাল) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ঐ স্থানে আভিধানিক অর্থ হয়রান পেরেশান বুঝিতে হইবে। বর্তমানে বাংলাদেশে এতদদেশীয় ওয়াহাবী মোল্লাগণ কোরআনের তরজমায় ضال (দাল) শব্দের অর্থ গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট লিখিয়াছে। জানিয়া রাখুন, কোন ব্যক্তি যদি কোন নবী সম্পর্কে এই ধারনা পোষন করে যে, 'তিনি কিছু সময়ের জন্য গোমরাহ ছিলেন কিংবা গোমরাহ হইতে পারেন।' এ জঘন্য বদ-আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফের। এই জন্যে বাংলা ভাষায় সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে তাফসীর করিতে মনস্থ করিলাম ইন্‌শাআল্লাহ্ তায়ালা।

مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ(মাগদুবি আলাইহিম) দ্বারা কোন কোন লোক এবং ضَالِّيْنَ (দ্বোয়াল্লিন) দ্বারা কোন কোন লোকদের বুঝায় এ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। তিরমিজি শরীফের রেওয়ায়েত বা বর্ণনায় উল্লিখিত আছে যে, **মাগদুবি আলাইহিম** দ্বারা বুঝায় ইহুদী সম্প্রদায় এবং **'দ্বোয়াল্লিন'** দ্বারা বুঝায় নাছারা সম্প্রদায়। তাফসীরে এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা ঃ- (১) **মাগদুবি আলাইহিম** দ্বারা বুঝায় বদ-আমল ফাছেক এবং ফাজের এবং **'দ্বোয়াল্লিন'** দ্বারা বুঝায় কাফের। (২) **'মাগদুবি আলাইহিম'** দ্বারা বুঝায় কাফের এবং **'দ্বোয়াল্লিন'** দ্বারা বুঝায় মুনাফেক অর্থাৎ গোপনীয় কাফের। ইহার কারণ এই যে, সুরায়ে বাকারা শরীফে প্রথমতঃ মুসলমানের কথা বলা হইয়াছে, তারপর প্রকাশ্য কাফেরদের প্রসঙ্গে এবং অবশেষে গুপ্তকাফের মুনাফেকদের আলোচনা করা হইয়াছে। যদি এই স্থানে এই শব্দ সমূহের মর্ম এই হইয়া থাকে তবে সুরায়ে ফাতেহার তরতিব সুরায়ে বাকারার তরতিব অনুসারে হইবে। কেহ কেহ বলেন যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাহারা 'মাগদুবি আলাইহিম' এর অন্তর্ভুক্ত, আর যাহারা আল্লাহকে মানিয়া অন্যান্য ঈমানী বিষয়কে অমান্য করিয়া থাকে তাহারা **দ্বোয়াল্লিন**-এর অন্তর্ভুক্ত। ইহাও হইতে পারে যে, **'মাগদুবি আলাইহিম'** দ্বারা বুঝায় ঐ সমস্ত লোক যাহারা বদ-আকীদায় কুফুরীর সীমায় পৌছিয়াছে যেমন বর্তমান যুগের বেদাতী ফেরকা চকড়ালুভী এবং শিয়া, কাদিয়ানী এবং দেওবন্দী মোল্লা যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে তৌহিন প্রকাশ করিয়া বা অবমাননাকর আকীদা পোষণ করিয়া কাফের হইয়াছে। আর **দ্বোয়াল্লীন** দ্বারা বুঝায় ঐ সমস্ত লোক যাহাদের বদ-আকীদা কুকুফীর সীমায় পৌছে নাই। যেমন বাতিল পন্থীদের মধ্যেও কিছু কিছু লোক রহিয়াছে যাহাদের আক্কীদা কুফুরী পর্যন্ত পৌছে নাই। যাহা হউক, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, 'হে প্রভু। আমাদিগকে ঐ সমস্ত লোকদিগের রাস্তা হইতে রক্ষা কর যাহারা তোমার গজবে পড়িয়া অভিশপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে।"

فَائِدَه **ফায়দা বা উপকারিতা** ঃ- এ আয়াতের দ্বারা কতিপয় ফায়দা লাভ হয়। **প্রথমতঃ**- এই যে, ফেরেশতা ও নবী আলাইহিমুস সালামগণকে কখনও এক মুহূর্তের জন্যেও গোমরাহী বা পথ ভ্রষ্টতা স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা গোমরাহ বা পথহারা হইতে পারে না। এমন কি গোনাহের কাজও তাহাদের দ্বারা হইতে পারে না। যার কারণে আল্লাহর গজবে নিপতিত হইতে হয়। এই জন্যই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের এতআত বা অনুসরণের আদেশ রহিয়াছে এবং গোমরাহী ও বদ আমল হইতে বাঁচিয়া থাকার হুকুম হইয়াছে।

যেই মূহুর্তে বা সময়ে নবী রাসুলগণ পথহারা অবস্থায় কিংবা খারাপ আমলে লিপ্ত হইয়া পড়েন সেই মুহূর্তে তাহাদের নিকট হইতে দূরে সড়িয়া থাকা অপরিহার্য হইয়া পড়ে; অথচ ইহা কানুনে ইলাহী বা আইনের পরিপন্থী। অতএব, সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ ও আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম মাসুম বা নিষ্পাপ। 'ইসমতে আম্বিয়া' এ মাসআলায় দেওবন্দী ওয়াহাবী ও মওদুদী জমাত গোমরাহ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত সিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, পথভ্রষ্ঠ ও বদ মজহাবী লোকদের সংশ্রব হইতে দূরে অবস্থান করা একান্ত দরকার এবং আল্লাহ পাকের নেক বান্দা বা প্রিয়-বান্দাগণের সংশ্রব অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। বাতিল পন্থী বদ মজহাব অবলম্বীদের হইতে দূরে অবস্থানের কারণ এই যে যাহাদের ধন সম্পদ আছে তাহাদের অবশ্যই চোর ডাকাত হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা ভয়ানক ক্ষতির আশংকা থাকে। তদ্রুপ, ঈমান ও নেক-আমল মুমিন বান্দার মহা মূল্যবান সম্পদ এবং এই সম্পদ হেফাজত কল্পে মুমিন-মুসলমানদিগকে তথাকথিত বাতিল পন্থী বদ-মজহাবীদের সংশ্রব বর্জন করা এবং পথ ভ্রষ্টদিগের কুপথ হইতে দূরে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। জানা দরকার যে, ঈমানচোর বিষধর সাপ হইতেও মারাত্মক। সর্পের বিষাক্ত ছোঁবল শুধু প্রাণকে বিনাশ করিয়া থাকে, কিন্তু ঈমান-চোরের ঈমান-নাশক ছোঁবল দ্বারা মুমিনের ঈমান-আমল দু-ই বিনষ্ঠ হইয়া যায় ইহকাল পরকাল উভয়ই বরবাদ হইয়া যায়। অথচ আফসুসের বিষয়, অধিকাংশ দুনিয়াসক্ত মানুষের এই দিকে লক্ষ্য নাই। পক্ষান্তরে, বাতিলপন্থী বদ মজহাবীরা সুযোগ বুঝিয়া মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের মাধ্যমে ইসলামী ঐক্যের বুলি আওড়াইয়া হাক্কানী উলামা, আল্লাহ ওয়ালা পীর মাশায়েখ ও বুজুর্গ সুফীগণের সংশ্রব হইতে দূরে সড়াইতেছে। ইহাই, আমাদের যুগের ওয়াহাবী দেওবন্দী ও মওদুদী-পন্থী ইলিয়াসী তাবলীগি নামের মূর্খ জামাতের একতার হাল। ইদানীং ইহারা তৌহিদী জনতার স্লোগান দ্বারা সমস্ত বাতিল পন্থীদের ঐক্য গড়িতে চায়। আসলে, মুসলিম জনতা বা সুন্নী-জনতার ইহারা কেহই নহে।

তৃতীয়তঃ এই যে, এই সুরার প্রথমেই আল্লাহ পাকের হামদ বা প্রশংসা করা হইয়াছে এবং শেষে আল্লাহর গজব হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, আল্লাহ তায়ালার তারিফ প্রশংসা করা নেক বখত বা পূণ্যবান লোকদের বৈশিষ্ট্য সৌভাগ্যের কারণ অনুরূপভাবে, বদ-এতেকাদ ও বদ-আমল বদ-নসীব বা দূর্ভাগ্যের কারণ।

চতুর্থত ঃ এই যে, আল্লাহ পাকের প্রিয়বান্দা যখন যেথায় থাকুক, যে অবস্থায় থাকুক, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, ছোট বড়, দেশী বিদেশী, সাদা-কালো, প্রভৃতি

কোনও পার্থক্য নাই, সকলেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, সকলেরই গন্তব্যস্থল এক। কাজেই, আদি পিতা হজরত আদম আলাইহিস সালামের যুগ হইতে কিয়ামত অবধি সমস্ত আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ এক শামিয়ানার নীচে থাকিবে। কিন্তু আল্লাহর মরদুদ বান্দা বিভিন্ন ধরনের হইবে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিবে। কতক লোক এমনও হইবে যাহাদের ছুরত বা আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং কতক লোক হইবে যাহাদের চারিত্রেরও পরিবর্তন হইবে। যদিও তাহাদের কতিপয়ের মধ্যে একতার দোহাই থাকিবে কিংবা একতাবদ্ধ হইয়া বসবাসও করিবে, তথাপি, পরকালে তাহাদের একতা থাকিবে না, বরং পরস্পরে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হইবে। একমাত্র মুত্তাকীগণই একে অপরের বন্ধু হইবে।

পঞ্চমতঃ দুনিয়ার কষ্ট ও মুছিবত আল্লাহর গজব নহে। এই জন্যে, হাদিস শরীফে দুনিয়াকে মুমিন-বান্দার জন্য কারাগারতুল্য কষ্টের স্থান বলা হইয়াছে। আবার দুনিয়ায় শুধু শান্তিতে অবস্থানই আল্লাহর নিয়ামত নহে। কেননা, হাদিস শরীফে দুনিয়াকে কাফেরদের জন্য ভোগ-বিলাসের স্থান বলিয়া বলা হইয়াছে।

ময়লাযুক্ত অকেজো লোহাকে যেমন কর্মকার অগ্নিতে ফেলিয়া এবং হাতুড়ী দ্বারা পিটিয়া লোহাকে মূল্যবান করিয়া তোলে, তেমনি মুমেন বান্দা দুনিয়ার জিন্দেগীতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া এবং দুনিয়ার আবর্জনা মুক্ত হইয়া পরকালের চিরসুখের স্থান জান্নাত লাভের উপযুক্ত হয়। দুনিয়ার যে ধন সম্পদ আল্লাহ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে উহা আল্লাহর গজব এবং যে সব দুঃখ কষ্ট বালা-মুছিবত আল্লাহ পাককে স্মরণ করাইয়া দেয় তাহা আল্লাহর রহমত (অনুগ্রহ) স্বরূপ।

تفسير صوفيانه তাফসীরে সুফীয়ানা ঃ- সুফীয়ানে কেরাম বলেন যে, مغضوب 'মাগদুব' এবং ضال 'দ্বাল' ঐ লোক যে নূরের ছিটা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। অথবা مضغوب মাগদুব ঐ লোক যে ব্যক্তি প্রিয় পাত্র হইবার পর মরদুদ হইয়া পড়িয়াছে এবং ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর দরবারে হাজির হইয়া পরে গায়েব হইয়াছে। অথবা মাগফুর হইবার পর মাকহুর হইয়াছে। অথবা ঐ ব্যক্তি যে শান্তির জগত হইতে বাহির হইয়া অশান্তির জগতে অর্থাৎ তাকাব্বুরী বা অহংকারের পথে অগ্রগামী হইয়াছে। যেমন-ইবলিস লায়ীন এবং বাল আম ইবনে বাউরা।

ضالين 'দোয়াল্লীন' ঐ সমস্ত মানুষকে বুঝায় যাহারা ঐ স্থান পর্যন্ত পৌছে নাই। অথবা ঐ রাস্তায়ও চলে নাই। ঐ স্থান বড়ই সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ রাস্তায় পৌছিতে হয়। অতএব, মানুষের জন্য অবশ্য করণীয় যে, জাহেরী এলেম ও পরহেজগারীর উপর ভরসা স্থাপন না করা। বহু জমীনে ফসল পাকিয়া কাটিবার পূর্বেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। উহা কৃষকের বদ-নসীবি বা দুর্ভাগ্যের কারণ।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ

'হে আল্লাহ" আমাদের খাতেমা বিল খায়ের নসীব করুন।'

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আমরা তো কোন ছার, আল্লাহর প্রিয় মাহবুব বান্দা নবী-রাসুলগণ পর্যন্ত ইস্তেক্বামাতের দোওয়া করিতেন। হজরত ইউসুফ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিয়াছেন تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّالْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ শরহে ফেক্হে আকবারে রহিয়াছে যে, কোন এক ব্যক্তি সুলতানুল আরেফীন হজরত বায়েজিদ বুস্তামী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) কে জিজ্ঞাসা করিলেন-আপনার দাঁড়ি উত্তম না আমার বলদের লেজ? হজরত বায়েজিদ উত্তরে বলিলেন, 'ওহে শোন, আমি দুনিয়া হইতে যদি ঈমান সহকারে নিরাপদে যাইতে পারি তবে আমার দাঁড়ি বহুৎ উত্তম। নতুবা তোমার বলদের লেজই উত্তম বলিয়া গণ্য হইয়া যাইবে। তখন আমার জন্য দোজখ মঞ্জুর হইবে। কিন্তু তোমার বলদের জন্য তাহা হইবে না। হে অহংকারী মানুষ, কিশের কারণে অহংকার করিতেছ এখনও তোমার সামনে ছাকরাতুল মউত রহিয়াছে। কবরের সংকীর্ণতা, কিয়ামতের ভয়াবহতা এবং মিযানের চরম ফায়সালা ও পুলসিরাতের সুকঠিন পরীক্ষা রহিয়াছে পাশ করিতে হইবে, নতুবা জীবন বিফল ও বরবাদ। জানিয়া রাখুন, অনু মাত্রও অহংকার যার অন্তঃকরণে স্থান পাইবে তাহার ঠিকানা জাহান্নামে হইবে। নিরহংকারী বিনয় ও নম্রতার গুনে মুমেন বান্দা সমস্ত কঠিন মনজিল সমূহ আল্লাহপাকের ফজল ও করমে অতিক্রম করিবে। পুলসেরাতের ন্যায় কঠিন ও ভয়াবহ মনজিলও আল্লাহর রহমতেই অতিক্রম করিবে। আমাদের প্রাণ প্রিয় আক্বা ও মাওলা হুজুর পোরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুলসেরাতের নিকট অবস্থান করিয়া উম্মতের সাহায্য করিবেন।

لله الحمد نه مرديم رسيديم بدوست - افرين باد بريں همت مردانه ما

কিন্তু সকল কিছুর মূল আমাদের আক্বা ও মাওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

گر محمد کا ساته هو جائے - پهر تو سمجو نجات هوجائے

اعتراض এতেরাজ বা আপত্তিঃ আল্লাহ পাক গজব ও গোমরাহীর রাস্তাই কেন সৃষ্টি করিলেন? আবার শয়তানকেই বা কি হেতু সৃষ্টি করিলেন? নফছে আম্মারাই সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল। কতই না ভাল হইত এইসব ক্ষতিকর ও বিনাশক উপাদানগুলো সৃষ্টি না হইত। দুনিয়ায় আল্লাহর নাফরমানীও প্রকাশ হইত না। আল্লাহ পাক যদি নাফরমানীর কর্মসমূহে রাজী থাকিবেন তবে আজাব (শাস্তি) হইবে কেন? নতুবা ঐগুলো সৃষ্টির কারণ কি? ইহার বিস্তারিত উত্তর সুরায়ে বাকারার প্রথমদিকে দেওয়া হইয়াছে। সেই স্থানে শয়তানের ও বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। শয়তান সৃষ্টির রহস্যও তথায় আলোচনা করা হইয়াছে।

امين আমীন কবুল কর হে প্রভু!

'আমীন' ইছমে ফেইল অর্থ হইল এইরূপ কর, কবুল কর। ইহা কোরআনের আয়াত নহে। এই জন্যে ইহা কোরআনে পাকে নাই। এ কারণে অদ্যাবধি কেহ ইহা দাবীও করিতে পারে নাই। তবে হাঁ, সুরায়ে ফাতেহার শেষে ইহা পাঠ করা সুন্নাত। সুরায়ে ফাতেহা পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়েই আমীন বলা সুন্নাত। এইহেতু, সমস্ত দোওয়ার শেষে আমীন বলাও সুন্নাত।

امين 'আমীন' বলার ফজিলত ঃ

'আমীন' বলার ফজিলত সম্পর্কে তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফে এক খানা হাদিস বর্ণনা করা হইয়াছে। যথাঃ - হজরত জিব্রাঈল আমিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন যে, সুরায়ে ফাতেহার জন্যে আমীন এই রকম যেন কোন কিতাব কিংবা কোন লিখিত বিষয়ের জন্য সিলমোহর। অর্থাৎ সিলমোহর ব্যতীত যেমন কোন কিতাব বা লিখিত দলীল পরিপূর্ণ হয় না তেমনি আমীন ব্যতীত সুরায়ে ফাতেহা পরিপূর্ণ হয় না। হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন- امين 'আমীন' রাব্বুল আলামিনের মোহর যাহার দ্বারা বান্দার দোওয়া বা প্রার্থনায় মোহর লাগানো হয়। যেমন, মোহরযুক্ত চিঠি-পত্র কেহ খুলিতে পারে না প্রাপক ব্যতীত তেমনি আমীন সহকারে প্রার্থনাও বিফল হয় না। দোয়া হয়ত কবুল হইবে, নতুবা দোওয়া যদি মর্জিয়ে ইলাহীর অনুযায়ী না হইলে প্রার্থনাকারীর ছোওয়াব মিলিবে। হজরত ওয়াহাব বলেন **আমীন** শব্দের মধ্যে ৪ (চারটি) হরফ, আর **আমীন** পাঠকারীর জন্যে চারজন ফেরেশতা মাগফেরাতের দোওয়া করিয়া থাকে। হাদিস শরীফে আছে যে, যখন ইমাম সাহেব ولا الضالين পাঠ করে তখন তোমরা امين 'আমিন' বল। কেননা ফেরেশতাগণ এই সময় **আমীন** বলে, আর যাহার **আমীন** ফেরেশতাগণের **আমীনের** সহিত মিলিয়াছে তাহার জীবনের সমস্ত গোনাহ সমূহ আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দেন। হজরত ইমাম ফানারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহে তাফসীরে সুরায়ে ফাতেহায় বলেন শয়তান ঐ দোওয়ায় নিরাশ হইয়া পড়ে, যে দোয়ার শেষে আমীন বলা হয়। কেননা, শয়তান জানে যে, এই দোয়ার মোহর লাগানো হইয়াছে ইহাকে নষ্ট করা যাইবে না (তাফসীরে রুহুল বয়ান শরীফ)। দোওয়া প্রার্থনাকারী এবং যাহারা **আমীন** বলে সকলেই দোওয়ার মধ্যে শামিল। এইহেতু, আল্লাহ তায়ালা হজরত মুসা ও হজরত হারুন আলইহিমুস সালামকে বলেন- قَدْ أُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا

অর্থাৎ- তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হইল। অথচ দোওয়া কেবল হজরত

মুসা আলাইহিসসালাম একাই প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং হারুন আলাইহিস সালাম কেবল আমীন বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই দোয়া উভয়ের প্রতি সম্পৃক্ত করা হইয়াছে। বুজুর্গানে কেরাম বলেন যে, মুসলমানদিগের মাহফিলে বা সমাবেশে দোওয়া করা উত্তম। কেননা, এমতাবস্থায় একজন দোয়া করিবে আর বাকী সকলেই আমীন বলিবে-উহাদের মধ্যে যদি একজনের আমীন কবুল হইয়া যায় তবে ইনশাআল্লাহ সকলের দোওয়া কবুল হইয়া যাইবে।

امين সম্পর্কে মাসায়েল ঃ

(১) সর্ব প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমীন কোরআনে কারীমের শব্দ নহে, বরং শুধু দোয়া মাত্র এবং আমীন দোওয়া হওয়ার প্রসঙ্গে কোরআন-হাদিস এবং মুসলমানদিগের ঐক্যবদ্ধ সম্মতি-ই দলীল স্বরূপ। আল্লাহ পাক হজরত হারুন আলাইহিস সালামের আমীন বলাকেই 'দোওয়া' বলিয়া ইরশাদ করিয়াছেন উপরন্তু, হুজুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও امين শব্দকে কোরআন বলেন নাই। তাই, কোরআনেও উহা লিখিত হয় নাই। অতএব, সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, 'আমীন' শব্দটি কোরআনের অংশ বিশেষ নহে, বরং ইহা দোয়া মাত্র।

مسئله মাসআলা ঃ ইমামের পিছনে উচ্চস্বরে না বলিয়া আস্তে বা খুব নিম্ন আওয়াজে **আমীন** বলা উত্তম। নামাজের বাহিরেও নিম্নস্বরে **আমীন** বলা উত্তম। উচ্ছস্বরের পরিবর্তে নিম্নস্বরে আমীন বলিবার স্বপক্ষে কোরআন-হাদিস এবং সাহাবায়ে কেরামের আমলের দ্বারা যথেষ্ট দলীল মওজুদ রহিয়াছে। কোরআনে কারিমে আছে।

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً

তোমাদের প্রতিপালকের নিকট বিনয় সহকারে গোপনে (নীরবে) প্রার্থনা কর। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, দোয়া নীরবে মনে মনে করা উচিত। আর **আমীন** ও একটি দোয়া। কাজেই দোয়া মনে মনে করাই উচিত। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ-

অর্থ ঃ "হে প্রিয় মাহবুব! আলাইহিস সালাম যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে আপনার নিকট জানতে চায়, আপনি বলিয়া দিন আমি অতিশয় নিকটেই, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা আমি কবুল করিয়া থাকি যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে।" এ আয়াতে কারিমার মর্মে প্রমাণিত হয় যে, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা উচ্চ আওয়াজে চীৎকার করিয়া শোনাইবার প্রয়োজনীয়তা মনে করা অর্থহীন। বরং অনুচ্চ আওয়াজে কিংবা নীরবে স্বকাতরে বিনম্র বচনে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের

দরবারে প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু বান্দার গর্দানের শাহ-রগের চেয়ে অর্থাৎ বান্দার প্রাণের চইতেও অধিক নিকটবর্তী। অতএব আল্লাহর নিকট ধীর স্থিরভাবে অনুচ্চ আওয়াজে দোয়া প্রার্থণা করা উচিত এবং সুরাহ ফাতেহা পাঠান্তে **আমীন** নিম্ন আওয়াজে বা মনে মনে বলাই উত্তম ও শরীয়ত সম্মত।

احاديث মিশকাত শরীফ বাবুল কেরাত ফিচ্ছালাত-এ বর্ণিত আছে যে, ইমাম যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ **ওয়ালাদ দ্বোয়াল্লিন** বলে তখন তোমরা **আমীন বলিও;** ঐ সময় ফেরেশতাগণও **আমীন** বলিয়া থাকে। আর যাহার **আমীন** বলা ফেরেশেতাগণের **আমীনের** অনুযায়ী হইবে তাহার অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ সমূহ মাফ হইয়া যায়।

(বোখারী ও মুসলিম শরীফ)।

এ হাদিসের দ্বারা জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের **আমীনের** অনুযায়ী ইমামের পিছনের মোক্তাদীগণের **আমীন** বলা উচিত এবং তাহাতে অতীত জীবনের সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ হইয়া যায়। ফেরেশতাগণ নীরবে **আমীন** বলে যাহা আমরা শ্রবণ করি না। কাজেই আমাদেরও উচিত নীরবেই **আমীন** বলা। আর যদি আমরা উচ্চ আওয়াজে আমীন বলি তবে ফেরেশতাদের **আমীনের** বিপরীত হইয়া গেল। কাজেই, এ হাদিস শরীফের উপরও আমল হয় না এবং গোনাহ মাফেরও আশা করা যায়না। যাহা বলা হইয়াছে যাদের **আমীন** ফেরেশতাদের **আমীনের** অনুরূপ হইবে এ কথায় **আমীন** বলার কাইফিয়াত বা অবস্থার অনুরূপ বুঝায়, সময়ের প্রসঙ্গে নহে। যদি সময়ের প্রসঙ্গ হইত তবে ঐ সময় যে কেহ **আমীন** বলিবে ফেরেশতাদের অনুরূপ হইয়া যাইবে। তবে এ কথার শর্তারোপ কেন হইল যে, যাহার **'আমীন বলা'** ফেরেশতাদের অনুরূপ হইবে সে ব্যক্তির গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। সুতরাং ফেরেশতাদের ন্যায় নীরবে অনুচ্চস্বরে যে আমীন বলিবে সেই ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে ইহাই সঠিক সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় হাদিস ঃ হজরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামার সঙ্গে নামাজ পড়িয়াছিলেন; যখন হুজুর আলাই-হিস সালাম এই জায়গায় পৌছিয়া 'গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্ব দ্বোয়াল্লিন' পড়িলেন তখন ফরমাইলেন।

'আমিন ওয়া আখফা বিহা ছাওতাহু' امين وَاَخْفٰى صَوْتَه

অর্থাৎ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেহা শরীফ পাঠান্তে আমীন বলিলেন এবং তদীয় মুবারক কণ্ঠস্বরকে গোপন করিলেন। অর্থাৎ অনুচ্চ

আওয়াজে আমীন বলিলেন।
এই বিবরণকে ইমাম আহমদ এবং আবুদাউদ ও তালইয়াছী এবং তিবরাণী ও দারে কুতনী তদীয় সুনানের মধ্যে এবং ইমাম হাকেম তদীয় মুস্তাদরাকের মধ্যে সহীহ সনদের সহিত বর্ণনা করেন। এ হাদীসটি অবশ্যই সহীহ্ সনদ বিশিষ্ট।

তৃতীয় হাদিস ঃ ইমাম মোহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ্ আলাইহে তদীয় আছারের মধ্যে, ইমাম আব্দুর রাজ্জাক স্বীয় মুনছাফের মধ্যে এবং ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহ আনহু হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হজরত ইবরাহীম নখয়ী বলিয়াছেন- ইমাম ৪ (চার)টি জিনিসকে আস্তে বা নিম্ন আওয়াজে পাঠ করিবে-(১) আউজুবিল্লাহ (২) বিছমিল্লাহ, (৩) ছোবহানাকা আল্লাহুম্মা এবং (৪) আমীন।

চতুর্থ হাদিস ঃ তিবরাণী তদীয় তাহ্জিবে, তাহ্তাবী এবং ইব্নে জরীর এবং ইমাম আবু হাফছ্ ইবনে শাহেদাঈন হজরত আবু ওয়াইল রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করেন-হজরত আলী ও হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা 'বিসমিল্লাহ' আওয়াজের সহিত পড়িতেন না এবং আমীনও পড়িতেন অল্প আওয়াজে বা অনুচ্চস্বরে।

পঞ্চম হাদিস ঃ উক্ত ইমাম তিবরানী কবীর এর মধ্যে উক্ত ইমাম আবি ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আলী এবং হজরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা নামাজের মধ্যে আউজুবিল্লাহ, বিছমিল্লাহ এবং আমীন উচ্চ আওয়াজে পড়িতেন না।

ষষ্ঠ হাদিস ঃ আইনী শরহে হেদায়ায় হজরত আবু মুআম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, সাইয়্যেদেনা হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-ইমাম ৪ (চার) জিনিষ আস্তে আস্তে বা নীচু আওয়াজে পাঠ করিবে- (১) আউজুবিল্লাহ (২) বিছমিল্লাহ (৩) আমীন এবং (৪) রাব্বানা লাকাল হামদ।
সপ্তম হাদিস ঃ এই হাদিস খানাই নির্বাচিত করিয়াছেন কানযুল উম্মাল নামক গ্রন্থে হজরত ইবরাহীম নাখয়ী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।
অষ্টম হাদিস ঃ- আবু দাউদ, তিরমিজি এবং আবি শাইবা ওয়ায়েল ইবনে হাজার রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করেন-তিনি বলেন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে, নবীজী পাঠ করিয়াছেন, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ পাঠ করতঃ আমীন বলিয়াছেন।
এবং
وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَه

অর্থঃ আমীন পাঠে আওয়াজ খুবই নীচু করিলেন।

নবম হাদিস ঃ- ইমাম বাইহাকী উক্ত ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করেন যে সাইয়্যেদেনা হজরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-ইমাম চার জিনিস নীরবে বলিবে (১) বিছমিল্লাহ (২) আমীন, (৩) রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ্‌ এবং (৪) আউজুবিল্লাহ।

দশম হাদিস ঃ দারুমী ও বাইহাকী-সাইয়্যেদেনা হজরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করেন, ক্বারী যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ (ওয়ালাদ দ্বোয়াল্লিন) পাঠ করেন তখন আকাশের ফেরশতাগণ **আমীন** বলেন, যাহার **আমীন** ফেরেশতাদের **আমীনের** ন্যায় হইবে তাহার জীবনের গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে।

عقلی دلیل আক্বলী বা যুক্তিভিত্তিক দলীলঃ **আমীন** ব্যতীত ও নামাজের মধ্যে যত দোওয়া আছে সবাই নীরবে মনে মনে অস্ফুট আওয়াজে পাঠ করতে হয়। যেমন - দোওয়ায়ে কুনুত, দোওয়ায়ে মাছুরা, ইত্যাদি আস্তে বা নীরবেই পাঠ করিতে হয়। যেহেতু, **আমীন** ও একটি দোওয়া, কাজেই তাহা নীরবে পড়াই উত্তম, সংগত এবং উচিত। নামাজে তাকবীর এবং তেলাওয়াত ব্যতীত কোন জিকিরই উচ্চ আওয়াজে পড়া হয় না এবং আমীন ও যেহেতু তেলাওয়াত এবং তাকবীরের বাহিরে; কাজেই, আমীন আস্তে পাঠ করা উচিত।

غیر مقلدون کا اعتراض গায়রে মুকাল্লিদদিগের প্রশ্ন ঃ গায়রে মুকাল্লিদ বা লা-মজহাবীরা বলে যে, বহু হাদীসে আসিয়াছে যে, আমীন উচ্চ আওয়াজে পড়িতে হয়। কেননা, তিরমিজি, আবু দাউদ এবং ইবনে মাজাহ শরীফে ওয়ায়েল ইবনে হাজার রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি নামাজে وَلَا الضَّالِّيْنَ ওয়ালাদ্ব দ্বোয়াল্লিন পাঠ করিয়াছেন এবং আমীন বলিয়াছেন।

مُدَّ بِهَا صَوْتَه আওয়াজ উচ্চ করিয়াছেন। তদ্রুপ, ইবনে মাজাহ-র রেওয়ায়েতে উল্লিখিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এতটুকু আওয়াজে **আমীন** বলিতেন যে, প্রথম কাতারের লোকেরা শ্রবণ করিতেন, আবার সমস্ত লোকজন এতবড় আওয়াজে আমীন বলিতেন মসজিদে শোর উঠিত। কাজেই, উচ্চ আওয়াজে আমীন বলাই উচিত।

জওয়াব ঃ উহার কয়েকটি জওয়াব বা উত্তর রহিয়াছেঃ-

১নং এই যে, কোরআনে পাকে আস্তে বা ধীরে ও অনুচ্চ আওয়াজে দোওয়া করিবার জন্য আদেশ রহিয়াছে এবং জানা দরকার যে, আমীনও একটি দোওয়া

আর ঐ হাদিস দ্বারা আমীন বড় আওয়াজে প্রমণিত হইলেও সুনিশ্চিতরূপে কোরআনের আয়াত বা হুকুমকে প্রাধান্য দিতে হইবে আবার ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হুজুর পোর-নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা নিজেদের কণ্ঠের আওয়াজকে উচ্চ করা হারাম এই প্রসংগেই আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ (তোমাদের কণ্ঠস্বর যেন আমার নবীর কণ্ঠস্বর হইতে উচ্চ না হয়।) যদি সুরায়ে ফাতেহার তেলাওয়াতের পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সহিত সমস্ত সাহাবীগণ যদি উচ্চ আওয়াজে আমীন বলিতেন, তবে অবশ্যই তাহাদের আওয়াজ হুজুরে পাকের কণ্ঠস্বর হইতে বড় হইয়া যাইত এবং উহা (এই আদেশ) আহকামে কোরআনের বিপরীত হইয়া যায়। অনুচ্চ আওয়াজে বা নীরবে আমীন বলার পূর্ণ বাহাছ ইনশাআল্লাহ হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান রাহমাতুল্লাহ আলাইহি প্রণীত 'জাআল হক' কিতাবের ২য় খণ্ডে আছে।

২নং উত্তর এই যে, যখন হাদিসের তাহকিক করা যায় তখন উচ্চ আওয়াজের হাদিসের মধ্যে শুধু সাইয়্যেদেনা ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত সহীহ যাহার মধ্যে مَدَّ بِهَا صَوْتَهٗ আসিয়াছে। আর ইহার মর্ম এই নহে যে, উচ্চ আওয়াজে আমীন বলিয়াছেন। বরং ইহার প্রকৃত মর্মার্থ এই যে, আমীন এর উচ্চারণকে লম্বা করিয়া পড়িয়াছেন। অর্থাৎ, আমীনের, আলিফ ও মিমকে মদের সহিত লম্বা করিয়া পড়িয়াছেন যেমন আ-মী-ন। এক্ষণে, صوت ছাওত শব্দের অর্থ বুঝিয়া লউন। 'ছাওত' শব্দ দ্বারা চীৎকারের আওয়াজ ও নিম্ন আওয়াজ বা অনুচ্চ আওয়াজ দুই-ই বুঝায়। আর যেহেতু হজরত ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত দ্বারা পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আস্তে বা অনুচ্চস্বরে আমীন বলিয়াছেন, তখন নিঃসন্দেহ এই রেওয়ায়েত-এ صوت ছাওত দ্বারা নিম্ন আওয়াজ বুঝিতে হইবে। যাহাতে উভয় রেওয়ায়েত বা বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

৩নং উত্তর এই যে, যে রেওয়ায়েত বা বর্ণনায় উচ্চস্বরে আমীন পড়িবার উল্লেখ রহিয়াছে, প্রথমতঃ ইহা সনদের ক্ষেত্রে সহীহ্ বা শুদ্ধ নহে। مَدَّ بِهَا صَوْتَهٗ দ্বারা আওয়াজ উচ্চ করিয়া পড়া, এই অর্থই সঠিক হয় নাই। এই রেওয়ায়েত সহীহ্ নহে, ইহা ঠিক নহে। পূর্বেই বলিয়াছি 'মাদ্দা' অর্থ বড় বা উচ্চ নহে, বরং লম্বা অর্থাৎ, এক আলিফ পরিমাণ লম্বা করিয়া পড়িতে হইবে। ইহাকে ক্বারীগণের মতানুসারে মদ্দে আছলী বলা হয়।

৪ নং উত্তর এই যে, যখন হাদিস সমূহের মধ্যে 'তাআর্রুজ' (বিরোধ) পরিলক্ষিত হয় তখন কিয়াসের মাধ্যমে উচ্চ আওয়াজের হাদিসের উপর নিম্ন আওয়াজের হাদিসকে তরজি (প্রাধান্য) দেওয়া হয়। যাহা কিয়াসের বিপরীত সে হাদিস তাহা

আমল করা হয় না যাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কাজেই, আস্তে বা নিম্ন-আমীন বলাই সংগত এবং বাঞ্ছনীয়।

৫ নং উত্তর ঃ নিম্ন আওয়াজে আ-মী-ন পাঠের স্বপক্ষে কোরআনে কারীমের সমর্থন রহিয়াছে এবং উহা কিয়াসের অনুকুল। কাজেই উহা গ্রহণযোগ্য।

৬নং উত্তরঃ এক্ষণে, একথা বিনা দ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে, গায়রে মুকাল্লিদ ওয়াহাবী লা মজহাবীরা অজ্ঞতা বশতঃ উচ্চস্বরে আমীন বলিয়া মসজিদে অযথা চীৎকার করিয়া মসজিদে শোর-গোলের সৃষ্টি করে. অথচ ইহা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। হ্যাঁ, ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার যে, উচ্চস্বরে **আমীন** বলিবার হাদিস মানছুখ (রহিত), এবং নিম্ন-স্বরে আ-মী-ন বলিবার হাদিস নাছেখ (রহিতকারী)। অতএব, বিনম্র-বচনে ও নিম্ন আওয়াজে **আ-মী-ন** বলা একান্তভাবে সংগত ও বাঞ্ছনীয় এবং উহা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

صلى الله تعالى على حبيبه و نور عرشه سيدنا ومولانا محمد
واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الرحمين امين

- ঃ সমাপ্ত ঃ-

রেজভীয়া দরবার কর্তৃক
প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থসমূহ

১। তাফছীরে রেজভীয়া ছুন্নীয়া ক্বাদেরীয়া-১ম খন্ড
২। তাফছীরে সুরায়ে কাউসার
৩। তাফছীরে সুরায়ে ফাতিহা
৪। মো' জেজায়ে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম
৫। আদিল্লাতুল ওরশ
৬। ইসলামি আকায়েদ ও দেওবন্দী আকায়েদ
৭। নেত্রকোনা জেলার বাহাছের রায়ের দ্বিতীয় প্রতিবাদ
৮। কালিমায়ে তৌহিদের তাফছীর ও রহস্য

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। রেজভীয়া এতিমখানা
সতরশীর, নেত্রকোনা।
২। মোহাম্মদ বদরুল আমিন রেজভী
আল ঈমান প্রিন্টিং প্রেস
মোক্তার পাড়া, নেত্রকোনা
৩। আবু সাঈদ ভূঁইয়া
হোটেল সাইদিয়া
১৮৯ ফকিরাপুল, ঢাকা।
৪। মোহাম্মদ আনছার আলী রেজভী
১০২ জয়নগর, নেত্রকোনা
৫। মাওঃ রুহুল আমিন রেজভী
সম্পাদক
আল্লামা রেজভী ও রাজিয়া বারিক স্মৃতি পাঠাগার
খিরাসার মোহনপুর দাখিল মাদ্রাসা, চান্দিনা, কুমিল্লা।
৬। কানু মিঞা
নিশান মাইক কোম্পানী
চান্দিনা বাজার, কুমিল্লা।